ঊর্দ্ধগামী

সুবোধ বসু-র

অন্যান্য উপন্যাস

উপন্যাস

- পদ্মা—প্রমত্তা নদী
- রাজধানী
- মানবের শত্রু নারী
- পদধ্বনি
- নবমেঘদূত
- পাখির বাসা
- চিমৃনি
- স্বর্গ
- সহচরী
- নটী
- স্ত্রী-যুদ্ধ
- বঙ্গিনী
- ইঙ্গিত

গল্প-সংগ্রহ

- বিগত বসন্ত
- জয়যাত্রা

নাটক

- অতিথি
- কলেবর
- তৃতীয় পক্ষ

কিশোর-সাহিত্য

- বুদ্ধির্যস্ত
- পদ্মা নদীর ডাক

উর্দ্ধগামী

সুবোধ বসু
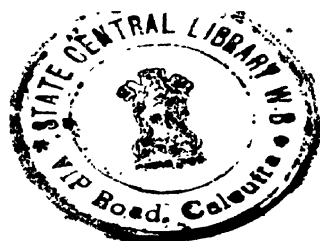
গ্রন্থাগার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রচ্ছদচিত্র
শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত
ব্লক
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক
গ্রন্থাগার, পি ৫৮ ল্যান্সডাউন
রোড, কলিকাতা পক্ষে
শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু

এই উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে "বঙ্গশ্রী" মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়।
ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

এক

একটা গোলাপী রঙের খামের উপর গোলাপী চিঠিটা বাঁ হাতের তর্জ্জনী ও বুড়ো আঙুলে চাপিয়া প্রৌঢ় কাশীপতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট-ভাবে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় ছুটিয়া আসিলেন। পৃথিবী এবং ভাগ্য সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ জানাইতে হইলে এখানে ছুটিয়া আসাই তাঁর অভ্যাসে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজও আসিলেন।

সার্কাসের ঘোড়ার মতো একটা অনাহার-ক্লিষ্ট ভাব এবং ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়ার মতো একটা ক্লান্তি যেন রেষারেষি করিয়া কাশীপতিবাবুর মুখে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। ষাটের কাছাকাছি বয়স; লম্বা দেহটা কাঁধের কাছে পৌঁছিয়া তবে কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চোখে চশমা পরেন না; আধ পাকা, আধ কাঁচা ঘন ভ্রূ জানালার উপরকার কার্ণিশের মতো সামনে ঠেলিয়া আসিয়াছে। চোখের চাউনি মার-খাওয়া কুকুরের মতন; অত্যাচারিত হইয়া যেন আত্মরক্ষার্থে সর্বদাই প্রস্তুত, অথচ যেন নিজের শক্তির উপর ভরসা করিতে পারিতেছেন না।

'দেখলে, একবার কাণ্ডটা দেখলে?' কাশীপতি রন্ধন-নিরতা স্ত্রী বিরজাসুন্দরীর উদ্দেশে কহিলেন। 'একটু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠব, তার কি উপায় আছে! এ অত্যাচার, অত্যাচার! অত্যাচার ছাড়া এ আর কিছু নয়!'

বিরজা শব্দায়মান কড়াটা উনানের পাশে নামাইয়া সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাহিলেন। এবং স্থূল চেহারার সাদাসিধে, শান্ত প্রকৃতির গৃহিণী বিরজাসুন্দরী। জীবনের উপর তার যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তাহা তাহার ভাবলেশহীন মুখ হইতে বুঝিবার উপায়

নাই। সরল ভাল মানুষ। খাটুনিকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে, নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করা চলে, তাহা পর্য্যন্ত তিনি ভাবিতে পারেন না। জগতটা তাহার কাছে একটা মাত্র ছোট সংসার, এবং ইহার সমস্যা স্বামী ও সন্তানদের খাওয়া এবং পরার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা ছাড়া অন্য কোনও সমস্যার উদয় হইলে তিনি যেন অথৈ জলে গিয়া পড়েন।

'কিছুর মধ্যে কিছু নেই,' কাশীপতি আহত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হুট্ করে' এই চিঠি। নাও, এবার ঠেলা সামলাও।'

'কার চিঠি? বিয়ের নেমন্তন্নো পত্তর নাকি?' বিরজাসুন্দরী নামানো কড়াটা আবার উনানে চাপাইবার উদ্যোগ করিলেন।

'তবে আর বলচি কি।' কাশীপতি বিরক্তভাবে কহিলেন। 'নিবারণের মেয়ের বিয়ে। ৭ই অগ্রাণ। নাও, এবার তার ঠেলা সামলাও!'

রান্নাঘরেরই উনানের কাছ হইতে কিছু দূরে কাশীপতির বড়ো মেয়ে সুষমা বাবার অফিসের টিফিনের জন্য রুটি বেলিতেছিল; সে খুসি-মুখে মুখ তুলিয়া কহিল, 'নন্দার বিয়ে নাকি, বাবা? এতো খুব ভালো খবর।'

'ভাল খবর বৈ কি।' বলিয়া কাশীপতি প্রায় আছাড় মারিবার মতো করিয়া চিঠিটা সুষমার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। 'তাদের মেয়ের বিয়ে, ইদিকে আমার তো প্রাণান্ত। ধার না করলে এ-মাসে আর পাই পয়সাটি বাড়্তি-খরচা করবার উপায় নেই। অথচ কুটুম্বিতের ত্রুটি হলে তোর মাসি কি আমার পিণ্ডির জোগাড় না ক'রে ছাড়বে? যত সব! এত দিকে এত আন্দোলন হচ্ছে, অথচ এই যে কশাইয়ের মতো গলায় পা দিয়ে লৌকিকতা আদায় করা, এর দিকে কারুর নজর পড়ে না। আবার পাছে জিনিষ দেওয়ার কথা ভুলে যাই, তাই

ফলাও করে' লেখা হয়েচে, "লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।"…নাও, যা হয়েচে আমাকে চট্ করে দিয়ে দাও। নটা বাজে। নাকে মুখে চাট্টি গুঁজে ট্রামে আবার সেই বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে হবে তো!

কাশীপতি তাহার মুষ্টিমেয় শ্রোতার সভায় তীব্র প্রতিবাদ সমাপ্ত করিয়া তাড়াতাড়ি শুইবার ঘরে আসিলেন। স্নানের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া যে ফর্সা ধুতিটা লুঙ্গির মতো করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছেন, এইবার তাহা যথোচিতভাবে প্লেট্-করা হাতাবিশিষ্ট আধফর্সা শার্টের উপর আঁটো করিয়া পরিলেন। কোটটা কোণার আল্না হইতে পাড়িয়া আনিয়া তাহার উপর দুইটা থাপড় বসাইয়া কাছের বৃদ্ধ ও বিবর্ণ চেয়ারটার পিঠে মেলিয়া রাখিলেন, খাওয়া সারিয়া অফিস যাইবার ঠিক আগের মুহূর্তে গায়ে পরিবেন।

গত পয়ত্রিশ বছর ধরিয়া ইহাই তাহার নিয়মিত রুটিন। নটায় স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাইতে বসেন। শার্টের উপর ধুতি আঁটিয়া পরিয়া, তাহার উপর কোট চড়াইয়া বার্ড, এডওয়ার্ড অ্যাণ্ড জন্সন্ কোম্পানীতে হাজিরা দিতে ছোটেন। এই নিষ্ঠার দরুণ একদিন যে কেরাণী মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে বহাল হইয়াছিল, সে এখন যুদ্ধের ডিয়ার্নেস্ অ্যালাউয়েন্সসহ প্রায় দুশো টাকা বেতন পাইতেছেন।

মাত্র কয়েক বছর আগে পর্য্যন্তও তিনি তাঁহার এই ক্রমোন্নতিতে বেশ সন্তুষ্ট ও গর্বিত ছিলেন। তারপর যুদ্ধের দরুণ দ্রব্যমূল্য বাড়ার মুখে অফিসে নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের য়ুনিয়ন গঠিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রীতিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উদ্যোক্তারা তাহা ট্রেড্ য়ুনিয়ন হিসাবে রেজিস্টারিভুক্ত করিল। সেই হইতে অফিসে উহারা নানা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। যে সব কর্ম্মচারিরা সাহেবদের ভয়ে প্রথমে যোগ

দিতে রাজি হয় নাই, ক্রমে তাহাদেরও অনেক ইহাতে যোগদান করিয়া ইহাকে কিছুটা শক্তিশালী এবং কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর বিরাগভাজন করিয়া তুলিয়াছে।

কাশীপতিবাবু বহুদিন ইহাতে যোগ দেন নাই, সাহেবদের চটাইবার তিনি পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ক্রমে যখন য়ুনিয়ন ধর্ম্মঘটের হুম্‌কি দেখাইয়া কোম্পানীর কাছ হইতে একটা মাগ্‌গি ভাতা আদায় করিতে সমর্থ হইল এবং সাহেবরা যতই রাগ দেখাক. য়ুনিয়নকে দাবাইতে সমর্থ হইল না, তখন কাশীপতিবাবুরও সাহস বাড়িল। তা ছাড়া, এই জয়লাভের পর যে সকল কর্ম্মচারি য়ুনিয়নের সদস্য নয়, তাহাদের উপর সদস্য হইবার জন্য চাপ পড়িল। কাশীপতি আর অমত করিলেন না। এখন তিনিও অফিস-য়ুনিয়নের সদস্য। তবে উগ্রপন্থী সদস্য তো ননই. বরঞ্চ য়ুনিয়নের বিতর্কে এবং ভোটে তিনি এখনও প্রচুর প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া ছাড়েন। ছোকরা কেরাণীরা তাহার নাম দিয়াছে, ‘রায়বাহাদুর’।

শুইবার ঘরের সাম্‌নেকার বারান্দায় আগে হইতেই ঠাঁই করা ছিল। সুষমা থালা সাজাইয়া কাশীপতির সম্মুখে আনিয়া দিল। কাশীপতি বাক্যব্যয় না করিয়া গরম ভাত হইতে উষ্ণ বাষ্প ছাড়াইবার জন্য তাহাতে আঙ্গুলের খোঁচা মারা শুরু করিলেন।

সুষমা কহিল, ‘ভাত ঠাণ্ডা করে’ দিয়েছি, বাবা। তুমি খাও।’

সুষমা বছর কুড়ি একুশের অবিবাহিতা তরুণী। বাপের ধরণে লম্বা এবং ছিপ্‌ছিপে। মায়ের ফর্শা রং পাইয়াছে। মায়ের মতো শান্ত মুখ। পিতার জন্য প্রায় একটা বাৎসল্য ভাব যেন তার দৃষ্টিতে ব্যক্ত হইতেছে।

ডাল সমাপ্ত করিয়া তরকারীর বাটিটা ধরিবেন কিনা দ্বিধা করিয়া কাশীপতি কহিলেন, ‘চচ্চরি খেলাম না? আবার একটা তরকারী

কেন! কতদিন তোর মাকে বলিচি, অফিস যাওয়াব মুখে এত আমি খেতে পারি নে। একটা ডাল, একটা কিছু সেদ্ধ হলেই আমার যথেষ্ট। অফিসে গিয়ে খাটতে হবে তো। এমন ভরা পেটে··· আবার কি?···' কাশীপতি সবিস্ময়ে উপর দিকে চাহিলেন।

বিরজাসুন্দরী একটা কাঁসারিতে ধোঁয়া-তোলা মাছের ঝোল লইয়া আসিয়াছিলেন। এখনও ঝোলটা যথেষ্ট ঘন ও সুস্বাদু হয় নাই, কিন্তু আর দেরি করিলে কাশীপতির নাগাল পাওয়া যাইবে না। তাই উনানের উপর হইতেই এক টুক্‌রা মাছ উঠাইয়া আনিয়াছেন।

সহসা কাশীপতি চটিয়া আগুন হইলেন। চেঁচাইয়া আহত কণ্ঠে কহিলেন, 'মাছ! আবার মাছ! না, আমি খাব না, কিছুতেই খাব না। পই পই করে তোমাদের বারণ করেচি, এত সব গিলে আমি অফিস যেতে পারিনে, কষ্ট হয়, এত সব আমার চাইনে, অথচ নিত্যি তোমরা···'

'সবার জন্যই মাছ হচ্চে, আর তুমি খাবে না!' বিরজা নির্ব্বিকার মুখে কহিলেন। 'এ হলে মেয়েরাও খেতে চায় না। তারাপদ শুনলে রাগ করে। বলে, "কম মাছ আসে, সবাই কম খাবে; তা বলে তোমরা না খেয়ে আমাদের ভাগ বাড়াবে, তা হবে না। এত দামের মাছ, কত লোক তো মোটে খেতেই পারে না, আমরা তবু তো একবেলা করে রোজই খাচ্চি।"···'

'আরে কি মুস্কিল,' কাশীপতি ধরা পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। 'আমি কি সে-কথা বলচি। রেখে দিলে ও-বেলা কি খাওয়া যেত না? একেই পেট ভরে গেছে, তার ওপর···' বলিয়া মাছের টুকরার সম্মানে তিনি বেশ কিছুটা ভাত মাখিয়া লইলেন।

আঁচাইয়া ঘরে গিয়া কাশীপতি অপরিহার্য্য কোটটি গায়ে পরিলেন। সুষমা পানের কৌটায় পান সাজিয়া লইয়া আসিল। কাশীপতি তাহার গোটা দুয়েক মুখে পুরিয়া কৌটাটি পকেট-জাত করিলেন।

সুষমা বলিল, 'দাঁড়াও বাবা, আমি তোমার টিফিন-বাক্স এনে দিচ্ছি!'

'তা না নিয়ে কি তোর কাছে ছাড়া পাব।' প্রশ্রয়ের সঙ্গে কাশীপতি কহিলেন। 'পয়সা থাকুক, আর না থাকুক, সবই হাওয়ার থেকে হচ্ছে। এই তো আয়, তবু ভাগ্যিস তারাপদ একটা লাইনে গিয়েছিল, ক'টাকা আয় বেড়েচে। নইলে এই মাগ্‌গির বাজারে সবাইকে উপোস করে মরতে হতো। এর উপর আবার যদি আত্মীয়তা কুটুম্বিতের বোঝা ঘাড়ে চাপে, বল্ তো তবে বাঁচবার উপায় কি? আর তা-ও বলি, এই কি তারাপদর উপযুক্ত কাজ? কত উঁচু বংশ আমাদের! এক সময় গুপ্তিপাড়ার দত্তদের না চিনত কে? দানে-ধ্যানে, ক্রিয়া-কাণ্ডে সে এক রাজা-রাজা ভাব! আমাদের বাড়িতে মেয়ে দেবার জন্য, আমাদের ঘরের মেয়ে নেবার জন্য সে যেন এক কাড়াকাড়ি! সেই বংশের আজ এই দুর্দ্দশা! আমার ছেলেকে আজ মোটরমিস্ত্রির কাজ নিতে হয়েছে। অথচ তার এই একশো সোয়াশো টাকা আসচে বলেই এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে কোনও মতে টিকে আছি।' বলিয়া সহসা যেন একটু দ্বিধা করিয়া গলার স্বরটা কিছুটা নিচু করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁরে সুষি, হরিপদকে ক'দিন ধ'রে দেখচি নে। বাড়িতে আসাই ছেড়ে দিয়েছে বুঝি?'

'না তো।' সুষমা একবার বৃদ্ধের করুণ মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া প্রায় সান্ত্বনার সুরে কহিল, 'মেজদা প্রায়ই এখন বাড়িতে এসে খান-দান, থাকেন। দুদিন হলো কোন্ একটা পার্টিকে জমি দেখাতে ঝাড়গ্রামে নিয়ে গেছেন, তাই—'

'হুঁ: ! জমি দেখাতে !' কাশীপতি অসন্তুষ্ট মুখে কহিলেন, 'রেসে হেরে, গাঁজা-ভাঙ খেয়ে কোন নর্দ্দমায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।...দে, টিফিন এনে দে।'

'এই দিচ্ছি, বাবা।' সুষমা কহিল। 'কিন্তু মেজদা আর রেসে যান না। বুকির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে। মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর জুয়োর মধ্যে থাকবেন না। এমন কি লটারির টিকিট বেচাও ছেড়ে দিয়েছেন। এবার জমির দালালি করবেন। বলেন, শীঘ্রি একটা ভালো আয় হবে। দালালি করে কত লোক...'

'সবই করেচে !' বলিয়া কাশীপতি খাটের পেছনে লক্ষ্মীর আসনের কাছে অফিস যাইবার আগেকার প্রাত্যহিক প্রণাম জানাইবার জন্য আগাইয়া গেলেন।

কাশীপতির বড়ো ছেলে দুর্গাপদ বিবাহের পরই কানপুরে কাজ লইয়া সস্ত্রীক সেখানে চলিয়া গেছে। বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় না থাকিবার মতো। কালে-ভদ্রে ভদ্রতা করিয়া বাপকে দু' পাঁচ টাকা পাঠায়, বছরে এক আধখানা চিঠি লেখে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপদ জুয়াড়ি ও ভবঘুরে, সে সংসারের উৎপাত, সহায়ক নয় ! ছোট ছেলে তারাপদ শহরের একটা বিখ্যাত গ্যারাজে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী হইয়া ঢুকিয়াছে। এক মাত্র সেই সংসারের উপকারে আসে !

'উমাকে ডাক দিকি একবার।' কাশীপতি সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিলেন, যেন দেবতার কাছে প্রণাম জানাইবার পূর্ব্বে সাংসারিক সকল ঝামেলা মিটাইয়া পরিষ্কার হইতে চান।—'কি জানি সে আনতে বলেছিল। না নিয়ে এলে আবার হৈ-হাঙ্গামা বাধাবে।' ছোট মেয়ে উমার হৈ-হাঙ্গামাকে কাশীপতি সমীহ করিয়া চলেন।

'উমা বাড়ি নেই।' দরজার কাছে থামিয়া পড়িয়া সুষমা কহিল।

'কোথায় গেল ?'

'পাশের বাড়ি গেচে।'

'কেন? পাশের বাড়িতে কেন?' সহসা কাশীপতির কণ্ঠস্বর আবার বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

'রেডিয়োতে কি একটা গান হবে। সেই গানটা শিখতে গেছে বাবা।'

সহসা কাশীপতি আগুন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'আমি কি বাড়ির কেউ নই? আমার কথার তাচ্ছিল্য করতে কারুর গায়ে লাগে না? এই যে আমি হাজার বার বলেচি, খবরদার, ওবাড়িতে যাবে না, মোটেই যাবে না, তাকি কারুর কানে পৌঁচাচ্ছে! যারা অমন গুমোর দেখায়, বড়লোকি চাল মারে, যেচে তাদের বাড়িতে সর্ব্বক্ষণ যাতায়াত করতে লজ্জা হয় না? এই যে ওদের বাড়ির কর্ত্তা সেদিন আমাকে পষ্ট অবজ্ঞা দেখালে, যেন চিনতেই পারলে না, বলি তাতে কি সারা বাড়িরই অপমান হলো না? একটা পুরানো পৈতৃক বাড়ি আর ভাঙা একটা মোটরগাড়ি আছে বলেই ধরাকে ওরা সরা মনে করতে পারে; কিন্তু আমরা ওদের খাই না পরি? আর বংশের যদি তুলনা করি, তবে আমার কাছে দাঁড়াতে পারবে? কুলি খাটিয়ে জাহাজের মাল খালাস করে কিছু টাকা কামালেই কুলির সর্দ্দার কুলিন হয়ে ওঠে না। আসুক উর্মি, আজ ওরই একদিন আর আমারই একদিন। মেরে ওর হ্যাংলাপনা ঘোচাব। রেডিয়ো শুনতে গেছেন! বাড়ির কোনও কাজকর্ম্ম করবে না, কেবল মর্জ্জি করে বেড়াবে। ও মেয়েটার স্বভাব হয়েছে ঠিক ঐ হরিপদটার মতো, সেই রকম চালচলন, সেই রকম—'

'বাবা, সাড়ে নটা বেজে গেচে!' সুষমা শান্তভাবেই কহিল।

'ওঃ, তাই নাকি!' বলিয়া কাশীপতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্রুত প্রণাম সারিতে গেলেন।

দুই

বাড়ির চেহারা দেখিয়া যেমন সামাজিক শ্রেণীবিভাগে গৃহস্থের স্থান-নির্দ্দেশ করা চলে, তেমনি শহরের এই পাড়াটা দেখিয়া ইহার জাত-নির্ণয় করা কঠিন নয়। এ-রাস্তায় পুরানো সম্ভ্রান্ত পরিবারের দু' চারখানা ফটকওয়ালা বড়ো দালান নাই, এমন নয়, তবে ইহারা রাস্তার অধিকাংশ বসত-বাড়ির জাত লুকাইতে সমর্থ হয় নাই। রাস্তাটা চওড়া নয়, খুব পরিষ্কারও নয়। মুদি ও মনোহারি দোকান, চা-চপের স্টল ও হেয়ার কাটিং সেলুনগুলি সমস্তই এ পাড়ার বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক স্তরের মাপে অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন।

দু'ধার ধরিয়া পাকা বাড়ি চলিয়া আসিবার পর সহসা রাস্তাটা যেন তার এই সামান্য বাবুয়ানাও রক্ষা করিতে পারে নাই, বিভিন্ন সরু গলির সুযোগ লইয়া ভিতর দিকে মাটকোঠা ঠাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাস্তাটা ধরিয়া উত্তর দিকে কিছু আগাইলে দেখা যাইবে. একমাত্র সামনের ইটের দোকানঘরগুলি ছাড়া, পিছনের সমস্তটাই খোলার বস্তি। যেন মুখে একটা ঠুন্‌কো মুখোস পরিয়া রাস্তাটা নিজেকে ভদ্রলোক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছে।

কালীঘাট অঞ্চলের এমনি একটি রাস্তায় কাশীপতিবাবু একটা অর্দ্ধজীর্ণ বিবর্ণ দো-তলা বাড়ির এক তলার ভাড়াটে। বস্তির সীমানা যেখান হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার কয়েকখানা বাড়ি আগে বাসা লইয়া যেন তিনি অতি কষ্টে ভদ্রতা বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এ-বাড়ির দোতালায় উঠিলে বস্তির অন্তহীন মাটকোঠা অন্তহীন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চোখে পড়ে। কাশীপতিবাবুর বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়াইলে অনতিদূরবর্ত্তী গলির মুখে বস্তির বাসিন্দাদের ঢোকা ও

বাহির হওয়া সহজেই নজরে পড়ে। তবে বস্তির ছোঁয়াচ না হউক, ছোঁয়া বাঁচাইবার পক্ষে বাড়িটা যে যথেষ্ট দূরে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে কাশীপতি যথেষ্ট সজাগ, এবং বাড়ির অন্যান্যেরাও উদাসীন নহে।

বেলা আড়াইটারও কিছু বেশি হইয়াছে। মাকে শুইতে দিয়া সুষমা ও উমা নিজেদের শুইবার ঘরে আসিল। কাশীপতি অফিসে যাইবার পর কাজের তাড়াহুড়াটা কমিয়া আসে। তারাপদর খাইতে আসিতে একটা দেড়টা। খাওয়া-দাওয়ার পাট সারিতে রোজই দুটো আড়াইটা বাজে। ইহার পর বিরজাসুন্দরীকে একটু ঘুমাইয়া লইতে হয়; দুই বেলার খাটুনির মধ্যে একটা ক্লান্তিহরা পূর্ণচ্ছেদ চাই।

মায়ের ঠিক পাশের ঘরটিই দুই বোনের। দুটি ছোট তক্তপোষ আঁটিয়াও দুইয়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক আছে। বাইরের দিকে দুটি জানালা পাঁচিলের পর্দ্দায় আড়াল করা। দুই জানালার মাঝামাঝি বার্ণিশবিহীন একটা ছোট টেবিল নক্সা-আঁকা কালো রঙের টেবিল-ক্লথে ঢাকা। এরই উপর ফ্রেমে-বাঁধা একটা মাঝারি সাইজের আয়না এবং কিছু প্রসাধনের সরঞ্জাম রাখা আছে। দেওয়ালের গায়ে দুটি কেরোসিন কাঠের ব্র্যাকেট দুই বোনের জন্য বরাদ্দ। নিজ নিজ তোরঙ্গ নিজ নিজ তক্তপোষের নিচে।

সুষমা টেবিলের উপর হইতে উলের গোলা ও বুনিবার কাঁটা তুলিয়া লইয়া কহিল, 'এবার বল, কি এমন মজার খবর।'

'বয়ে গেছে আমার বলতে।' বলিয়া উমা দুষ্টু হাসিয়া বালিসের নিচ হইতে পাতা-খোলা একটা উপন্যাস বাহির করিয়া বিছানাতে চিৎ হইয়া গড়াইয়া পড়িল। চোখ মিটিমিটি করিয়া

কহিল, 'তোমার সব কথা তুমি আমাকে বল যে আমার সব কথা তোমাকে বলব!'

উমার বয়স আঠারো-উনিশ; সুষমার চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট। মাথায়ও সে কিছুটা ছোট হইবে, কিন্তু সুষমার মতো অতটা রোগা নয়। মুখের গড়ন চোখা, পটল-চেরা চোখে চটুল দৃষ্টি। চলনে-বলনে চাঞ্চল্য; ঋজু দেহ-লতায় প্রতিটি ভাবাবেগ যেন হিন্দোল খেলিয়া যায়। যাহারা তাহাকে পছন্দ করে না, তাহারা বলে "ঢঙ্গী"; যাহারা ভালোবাসে, তাহাদের কাছে "জীবন্ত"।

'আমার আবার কি কথা!' মেঝেতে পা রাখিয়া সুষমা বিছানার উপর বসিয়াছে; দৃষ্টি অসমাপ্ত শেলাইয়ের ঘরের উপর নিবদ্ধ। 'রাজ্যের যত কথা সব তো তোরই থাকে।'

'হ্যাঁ, তা বৈ কি।' উমা চোখ নাচাইয়া কহিল। 'তুমি পেটে চেপে রাখো, আমি সব বলে দিই, তফাৎ তো এই। আমার মধ্যে অত ঢাক-ঢাক গুর-গুর নেই। শুধু কি তাই। তোমার মতো আমাকে যদি একটা ছেলে ভালোবাসত, তবে আমার বলবার কথার আর অন্তই থাকত না। তোমার মতো দাঁতে ঠোঁট কাম্‌ড়ে…'

'থাম, আর জ্যাঠামি করতে হবে না।' সুষমার কণ্ঠস্বরে এবার দিদি-সুলভ গাম্ভীর্য্য। 'যা জানো না, তা নিয়ে মস্করা করতে এসো না।'

'হ্যাঁলো, দিদি, হ্যাঁ, আমি সব জানি।' উমা খোলা উপন্যাসটা বুকের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া দুই চোখ দুষ্টুমিতে পূর্ণ করিল। 'এই যে প্রকাশবাবু প্রত্যহ দু' তিনবার ক'রে এ-বাড়িতে হাজ্‌রে দিয়ে যান, এ কি শুধু ছোড়দার সঙ্গে পরামর্শের জন্য। যারা সারাদিন একই জায়গায় কাজ করে, পরামার্শর যেন তারা আর সময় পায় না!…এতে দোষ কি ভাই, দিদি। করনা একেই বিয়ে। কাজটা

আর এমন কি খারাপ করে, ছোড়দাও যা করে, সে-ও-তাই। আর দেখতে তো রীতিমত…'

'উমি!' সুষমা অসন্তুষ্ট স্বরে কহিল।

'দোষ কি ভাই, দিদি।' উমা না-দমিয়া কহিল। 'বস্তিতে থাকে, এই তো! আজ বস্তিতে আছে, কালই দালানে এসে থাকবে। যে টাকা রোজগার করতে পারে, তার আর ভাবনা কি? আর আমরাই বা বস্তির থেকে আর কত দূরে আছি বল? দু' চারখানা বাড়ি দূরে! টাকা থাকলেই লোকে ভদ্র হয়, আর টাকা না থাকলেই ছোটলোক। পৃথিবীতে টাকাই সব। অথচ চোখের সামনে এত সব দেখেও বাবা কিছুই দেখবেন না; এখনও বংশের জাঁক ক'রে বেড়াচ্চেন। ভাবেন এখনও বুঝি…'

'বাবা আজ খুব রাগ করেচেন তোর উপর।' সহসা বাবার রাগের কথাটা সুষমার মনে পড়িল। 'দেখিস্ রমাদের বাড়ি গেলে বাবা রাগ করেন, তবু নিত্যিনিত্যি তোর যাওয়া চাই। কেন, ওদের বাড়িতে যাওয়ার কি দরকার? বাবাকে যারা মিছিমিছি অপমান…'

'রেখে দাও অপমান।' এবার উমাও প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'সব কিছুকেই তো বাবা অপমান ভেবে বসে আছেন। যদ্দিন ওঁর বংশের জাঁক না যাচ্চে, তদ্দিন কেউ ওঁকে খুশি করতে পারবে না। আমরা কি কেউ-কেটা, আমরা গুপ্তিপাড়ার দত্ত!' বলিয়া উমা সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'ও-ঘরে মা ঘুমুচ্চেন, খেয়াল আছে?'

'বাবা, বাবা! তোমার জন্যে প্রাণ খুলে একটু হাসবার পর্য্যন্ত জো নেই।…রমাদের টাকা আছে বলেই বুঝি ওরা মন্দ লোক? না, বাপু, আমার সঙ্গে তো কেউ বড়লুকি দেখায় না, না রমা, না তার মা-কাকীমারা। বাবার যত বাড়াবাড়ি! বড়লোকের সঙ্গে মিশচি,

তাতে দোষটা কি ? আমার নিজেরও তো বড়লোক হ'তে ইচ্ছে করে। টাকা হলে তবেই গুপ্তিপাড়ার দত্তদের গুপ্ত মান আবার চক্‌চকে হয়ে উঠত। আচ্ছা ভাই দিদি, হঠাৎ যদি অনেক টাকা পেয়ে যাই, কি রকম মজা হয় বল তো! রোজ নতুন দামি দামি শাড়ি পরচি, মোটরে ক'রে বেড়াচ্চি, গয়না কিনচি, সিনেমা দেখছি, তবে না গুপ্তিপাড়ার দত্ত!' বলিয়া উমা আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইল।

'খুবই ভালো হ'তো।' সুষমা চোখ বোনায় নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল। 'কিন্তু হঠাৎ টাকা পেয়ে যাওয়াটাই যা একটু কঠিন!'

'আচ্ছা, সিনেমা করলে কেমন হয়, দিদি? শুনেচি, সিনেমা স্টারেরা নাকি···'

'তা বৈ কি। দিনে দিনে খুব উন্নতি হচ্ছে।' এইবার সুষমা শেলাই হইতে চোখ উঠাইয়া কৌতুকহাস্যপরায়ণ উমার মুখের দিকে তিরস্কারভরা দৃষ্টিতে চাহিল। 'এ সব পরামর্শ কে দেয় শুনি? রমা না তার কাকীমারা?'

দিদির আতঙ্ক লক্ষ্য করিয়া উমা আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, 'দিদি যেন কি! সত্যিসত্যি যেন আমি ফিল্ম্ করতে নামচি।···রমার এক পিসতুত ভাই আছেন, ফিল্ম-ডিরেক্টর। ওদের বাড়ি মাঝে মাঝেই আসেন। তাকে দেখলেই সিনেমার কথা আমার মনে পড়ে। কত সহজেই না বড়লোক হওয়া যায়! অথচ আমরা দিনের পর দিন টাকার অভাবে হা-হুতাশ করচি; ইচ্ছে মত জামা-কাপড় কিনতে পারচি নে, ইচ্ছেমত···'

কিন্তু উমার নিবন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই সদর-দরজা খোলার শব্দ হইল। জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল।

শীঘ্রই একটা ভাঙা গলার অনতি-উচ্চ ডাক আসিল, 'সুষি, উমি, কোথায় রে তোরা? কেউ আচিস্?…'

'এই যাচ্ছি, মেজদা', বলিয়া সুষমা উল ও কাঁটা রাখিয়া ব্যস্তসমস্ত-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'মেজদা!' বলিয়া উমাও উপন্যাস মুড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিল।

বাড়ির ভবঘুরে ছেলে এই হরিপদ। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো বয়স। পরিবারের অন্যান্যদের ধাঁচে ঢ্যাঙা ও পাৎলা, কিন্তু যেন রস-নিঙড়ানো প্যাকাটির মত ভঙ্গুর ধরণের। চুল রুখ্‌খু, মুখমণ্ডল অ-কামানো দাড়িতে অপরিষ্কার, দাঁতগুলি প্রায় তামাটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে; চোখে একটা চোর-চোর ভাব।

পাড়ার আড্ডাবাজ বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া ছেলেবেলা হইতেই একটা পলায়নের ভাব তার মধ্যে প্রকাশ পায়। এ-ছুতায় সে-ছুতায় বন্ধুদের বাড়ি, পাড়ার ক্লাব বা অন্য যেখানে সেখানে এক-আধ রাত কাটাইয়া আসিয়া সে কাশীপতির তিরস্কার হজম করিতে শিখিল। তারপর ম্যাট্রিক ফেল করিয়া হরিপদ একদম হাওয়া; দু' তিন মাস আর তার খোঁজ নাই। অবশেষে নিজেই একদিন সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু পড়ার দিকে আর ঘেঁষিল না। পাড়ার ক্লাবের তব্‌লা-বাদক হইয়া প্রচুর তবলা বাজাইতে লাগিল। কিন্তু বাড়ির কর্ত্তৃপক্ষ তব্‌লার মর্ম্ম বোঝে না; ফলে হরিপদকে বীমার দালালি হইতে শুরু করিয়া পোস্তার আলু জগুবাবুর বাজারে আনিয়া বেচা পর্য্যন্ত নানা কাজের উদ্যোগ দেখাইতে হইয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত বাড়ির লোকেরা তার ভরসা ছাড়িয়া দেয়। তখন আপন প্রতিভার পথ অনুসরণ করিয়া হরিপদ পরিচিত ও অপরিচিতদের কাছ হইতে টাকা ধার লওয়া ও লটারির টিকিট বিক্রিতে হাত

পাকাইল। ক্রমে উন্নতি করিয়া সে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের বুক-মেকারের সহকারী হইয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছাড়িল। সম্প্রতি এই চাকরিটি গিয়াছে। ইহার জন্য একমাত্র বুকি-র অকৃতজ্ঞতাকে দায়ি করিয়া সম্প্রতি সে নতুন লাইনের দিকে মনোযোগ দিয়াছে। জমির দালালি যে খুবই লাভজনক ব্যবসা, তাহা পরিবারের সকলের কাছে বারবার উল্লেখ করিয়া সে উহাদের আশ্বস্ত করিয়াছে। প্রথম দাঁও মারিবার সুযোগ পাইয়া সে পার্টির সঙ্গে ঝাড়গ্রাম গিয়াছিল, এইমাত্র ফিরিতেছে।

'কিছু খেতে দিতে পারিস, সুনি? চিঁড়ে মুড়ি যা হোক।'

'ভাত আছে। তুমি নেয়ে এস।' সুষমা হরিপদর অভুক্ত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির কণ্ঠে কহিল।

'ভাত আছে!' হরিপদ যেন বর্ত্তাইয়া গেল। 'তবে তো ভালই হয়েচে। বড্ড খিদে পেয়েচে। শালারা ঘোড়দৌড় করিয়ে নিলে, অথচ মজুরির বেলায় লবডঙ্কা! হরিশবাবু অত ক'রে বল্লেন, তাই ব্যাটাদের সঙ্গে গেলাম। তিন-তিনটে দিন আমার না হ'ক্ নষ্ট হলো। যাক্‌গে, নতুন নতুন অমন দু'একবার···ভাতটা রেখে বড় ভাল করেচিস। আজই ফেরবার কথা বলে গিছলাম বুঝি?...'

উমা কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'হ্যাঁ, তুমি বলে যাবারই লোক বৈ কি! আর বলে গেলে সে-কথার কত দাম! ছোড়দা খেতে আসেনি, তাই তার ভাতটা ঢাকা আছে। চট্‌পট্ খেয়ে নাও। খেয়েই শাড়ির দোকানে নিয়ে যাচ্ছ তো? তৈরি হয়ে নেব?···'

'ঐ দেখো পাগ্‌লি!' হরিপদ সস্নেহে ছোট বোনের দিকে চাহিয়া হাসিল। 'এবারে আর শাড়ি হলো না। শালারা যে এমন ঠকাবে, তা কি আগে ভেবেছিলাম! নগদ পনেরোটি মাত্র টাকা গুনে দিয়ে কেটে পড়ল। তা বেশ, আমিও দেখে নেব!···তোর একটা ভালো

শাড়ি চাই তো ? তা বেশ, পাবি ; এক হপ্তার মধ্যেই পাবি। এক গাদা কাজ তো হাতেই আছে। হাতিবাগানের চৌধুরিদের ছোট তরফের প্রমোদবাবু সেদিন তো নিজ মুখে বল্লেন, "কদিন আগে এলে আলীপুরের নতুন বাড়িটা তোমার মারফতই কিনতে পারতুম : বসে বসেই কয়েক হাজার টাকা দালালি পেয়ে যেতে। তা বেশ, সম্পত্তি কেনা-বেচা তো আমার লেগেই আছে ; এবার থেকে তুমিই না হয় আমার দালাল হলে।···" তা যখন বলেচে, ঠিকই ডাকবে। পরশুর আগের দিনই তো ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি সেদিন ঝাড়গ্রাম চলেচি। বলে পাঠালাম, ফিরেই দেখা করব। এ ছাড়া আরও তিন তিনটে শাঁসালো পার্টি হাতে আছে। এ ব্যাটাদের মতো ফোতো পার্টি নয়। শাড়ি তুই একটা পাবিই।···তারাপদ খেতে এলো না যে বড় ? অফিসে কেউ খাওয়াচ্ছে বুঝি ?'

'খাওয়া নয়, মিটিং !' উমা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল।

'কে বলে গেল ?'

'কে আর ! যে সর্ব্বক্ষণ বলে যায় সেই প্রকাশবাবু ছাড়া আবার কে।' বলিয়া উমা দৃষ্টিটা তির্য্যক করিয়া সুষমার দিকে চাহিল। দেখিল, সে ইতিমধ্যেই হেঁসেলের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে।

গায়ে মাথায় ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া কয়েক ঘটি জল ঢালিয়া হরিপদ দু'মিনিটেই স্নান সারিয়া আসিল। গোগ্রাসে কয়েক গ্রাস ডাল ভাত গিলিয়া সে যেন কিছুটা ধাতস্থ হইল। দিল্-দরিয়া কণ্ঠে কহিল, 'সুষি, উমি, আজ সিনেমা দেখতে যাবি ? চ' "চন্দ্রশেখর" দেখে আসি।'

'আজকে থাক, মেজদা,' সুষমা হরিপদকে আরেক হাতা ডাল দিয়া কহিল।

উমা অধৈর্য্যভাবে প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'দিদির সবটাতেই বেশি-বেশি-পনা! কেন, আজ থাকবে কেন, শুনি? কেউ তো কখনও দেখায় না। মেজদা তবু দেখাতে চাইলে। অমনি হিসাবীপনা করে' বলা হলো, আজ থাক, মেজদা!'

'তুমি বরঞ্চ উমিকেই দেখিয়ে আনো, মেজদা।' সুষমা শান্তকণ্ঠে কহিল, 'একজন বাড়িতে না থাকলে মার বড় কষ্ট হয়! একলা সব সামলানো…'

'তা বেশ, আমি একাই যাব!' উমা জেদের সঙ্গে কহিল। 'যার কোনও শখ নেই তার সঙ্গে বুড়ি সেজে বসে থাকতে পারব না। বাবা, বাবা! কোনও দিনই যদি আনন্দ করতে পারবে। নিয়ে যাচ্ছ তো, মেজদা?…'

'যাচ্চি বৈ কি।'

'আগেই টিকিট কিনে এনো বাপু!' উমা গম্ভীর হইয়া কহিল। 'গিয়ে আমি ফিবে আসতে পারব না, আগেই বলে রাখচি।'

'তাও কখনও আসতে হয়! নগদ কড়কড়ে পনেরোটা টাকা আজ পকেটে আছে! টাকা থাকলে খরচা করতে এ শর্ম্মা পিছ-পা নয়।' হরিপদ সগর্ব্বে কহিল।

'চল্ না ভাই দিদি?'

'আর একটু তরকারি দেব, মেজদা?' উমার আগ্রহাতিশয্যে কান না দিয়া সুষমা ক্ষুধার্ত্ত হরিপদকে প্রশ্ন করিল।

'দে। থাকে তো আর একটু দে।' হরিপদ উদারতার সঙ্গে কহিল।

তিন

সন্ধ্যার পর রোজই কাশীপতিবাবু মল্লিকদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে যান। বিরজাসুন্দরী সুষমার সহায়তায় রন্ধনে ব্যাপৃত থাকেন। উমা গান সমাপ্ত করিয়া উপন্যাসে মনোযোগ দেয়। ছোট ছেলে তারাপদর কাছে বন্ধুবান্ধব আসে; সদর-দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বাঁ দিকের যে ঘরটি মিলিত বৈঠকখানা ও শয়নঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নানা দুর্বোধ্য আলোচনা ও সতেজ তর্ক জমিয়া ওঠে।

তারাপদ বছর সাতাশ-আটাশের গম্ভীর প্রকৃতির যুবক। পরিবারের অন্যান্যদের মতোই কৃশকায়, কিন্তু খুব ঢ্যাঙা নহে। শরীরের বাঁধুনি মজবুত ধরণের। নাকটা তীক্ষ্ণ, কপাল চওড়া, চোখের দৃষ্টি ধারালো। মুখে বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব এবং কিছুটা মননশক্তির পরিচয় আছে; তবে তাহার প্রকৃতিটা যে কিছু উগ্র ধরণের, তাহাও না লক্ষ্য করিয়া উপায় নাই।

কম্বাইন্‌ড্‌ বৈঠকখানা ও শুইবার ঘরটি তারাপদর রাজত্ব। এই রাজত্বটি চওড়ায় দশ ও লম্বায় বারো ফুট। ইহার একধারের দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপরিসর তক্তপোষে তারাপদর বিছানা সুজনিতে ঢাকা। উল্টা দিকে সমান মাপের আর একটি তক্তপোষ; এটি শতরঞ্জিতে আবৃত থাকিয়া ফরাসের কাজ করে এবং প্রয়োজন হইলে বিছানায় পরিবর্ত্তিত হয়। দুটো কাঠের ও একটা বেতের চেয়ার জানালার ধারের টেবিলটিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের কোনও মতে আঁটাইয়া লইয়াছে। টেবিলের উপর খোলা বই ও বিভিন্ন বর্ণের প্যাম্ফ্‌লেটের ভিড়। গোটা কয়েক শস্তা বুক-সেল্‌ফের উপর তাহাদের ক্ষমতার

অতিরিক্ত বই চাপাইয়া দেওয়ায় উটের পিঠের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তা সে যাই হউক, এসব লক্ষ্য করিবার পর শব্দ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তারাপদর আসক্তি যে রীতিমত প্রবল, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না!

বর্ত্তমানেও সে এই আসক্তিরই পরিচয় দিতেছিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বোম্বাই মেলের বেগে কলম চালাইতেছে! দুর্ব্বল টেবিলটা এই বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বারবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তারাপদ ইহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেছে না।

তাহার পাশেই বিছানার উপর তাহার সহকর্ম্মী ও বন্ধু প্রকাশ মজুমদার নির্ব্বাক বসিয়া ইহা হইতে রস উপভোগের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু খুব যে পাইতেছে, তাহা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছে না। এমন একটা জরুরি কাজে ব্যাঘাতসৃষ্টির জন্য সে যে উস্‌খুস্ করিতেছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অবশেষে প্রকাশ সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিল, 'বাৎসরিক ছুটির বরাদ্দ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত কি ঠিক হলো?...'

তারাপদ ইহার জবাব না দিয়া আরও কয়েক সেকেণ্ড লেখা চালাইয়া গেল। অবশেষে কাগজের উপর কলমের একটা অতিরিক্ত জোরালো খোঁচা মারিয়া তাহার উপস্থিত প্রতিপাদ্য সমাপ্ত করিল। লেখা কাগজটি উঁচু করিয়া চোখের সম্মুখে ধরিয়া সে কিন্তু তাহা পাঠ করিল না; কাগজের উপর চোখ নিবদ্ধ রাখিয়া প্রকাশের প্রশ্নের জবাব দিল।

'নিজে য়ুনিয়নের মিটিঙে যাবে না, অন্যের কাছ থেকে কি সুবিধে আদায় হলো জেনে নেবে, এটা কি রকম আচরণ? য়ুনিয়ন আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, একলার দায়িত্বও নয়; তোমাদের পাঁচ-

জনের জিনিষ। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও যদি দেখি, তোমরা কেউ হাজির নেই, ব্যাপারটাকে তুচ্ছ মনে করে…'

'বড় খিদে পেয়েছিল', প্রকাশ কিছুটা অপরাধীর মতোই কহিল, 'খেতে চলে এসেছিলাম। সাইকেলে এসেছিলাম; ভেবেছিলাম, মিটিং শেষ হওয়ার আগেই ফিরে যেতে পারব। এসে দেখি, তখনও রান্নাই শেষ হয় নি…'

প্রকাশ তারাপদর সমবয়সী। শক্তিমান দোহারা গড়ন। রং ফর্সার দিকে। হাতের পেশি লোহার মতো শক্ত। চওড়া বুক ক্রমে সরু হইয়া কোমরে নামিয়া আসিয়াছে। মাথার প্রচুর চুল ব্যাক্-ব্রাশ করিয়া আঁচড়ানো। পোশাকে একটু বাবুয়ানা লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় চোখ দুটি স্নিগ্ধ এবং মুখের সরলতা সুস্পষ্ট।

তারাপদর সঙ্গে একই গ্যারাজে প্রকাশ মেকানিকের কাজ করে। লেখাপড়াও তারাপদর সমান—ম্যাট্রিক পাশ। সামনের গলিটা দিয়া ঢুকিয়া বস্তির প্রথম বাড়িটাই তাদের বাসা। সংসারে এক বিধবা মা, অন্য দায়িত্ব নাই। মায়ের হাতে কিছু টাকা আছে। ইহার সাহায্যে বাড়ির সমুখের বড় রাস্তার উপর এক ফালি খালি জায়গা ভাড়া লইয়া সম্প্রতি সে ছোটখাট এক মোটর মেরামতের ওয়ার্ক-শপ্ খুলিয়াছে। এখনও তাহার কারখানায় যথেষ্ট সংখ্যক বিকল মোটরগাড়ি আকৃষ্ট হইতেছে না এবং হইলেও বেশি কাজ নেওয়ার মতো তার সামর্থ্য নাই, তবে টুকিটাকি মেরামত করিয়া কিছু বাড়্তি আয় হইতেছে।

'দেখ, প্রকাশ,' তারাপদ গম্ভীর ভাবেই কহিল, 'আমাদের আয়োজন যত সামান্যই হোক্, একেবারে তুচ্ছ নয়। যে মহাসংগ্রামের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি, এ কাজ তার পক্ষে অপরিহার্য্য। ক্যাপিটে-লিজ্‌মের বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত খাটিয়েদের মিলিত হ'তে হবে।

সব ওয়ার্কারের এই একমাত্র মন্ত্র, এই একমাত্র কর্ত্তব্য। পুঁজিবাদ চুরমার করতে হলে, শ্রেণীভেদ দূর করতে হলে, প্রোলিটারিয়েন স্টেট্ গড়তে হলে…'

'সে তো ঠিক কথা,' বাহুল্যভয়ে প্রকাশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া কহিল। 'আমরা যারা বস্তিতে বাস করি, তারা এই শ্রেণীভেদের অপমান…'

'তোর বস্তির খোলার ঘরে,' তারাপদ বাধা দিয়া কহিল, 'আর আমার এই পোড়ো দালানটাতে তফাৎ কতটুকু শুনি! আস্ত কাঁথা আর ছেঁড়া কম্বলে পার্থক্য কতখানি? আমার বাবা আমাদের বংশের জাঁক করেন; তার সমান আয়ের লোকের চাইতে নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনে করেন। এই পার্থক্যবোধ ওকে না দিতে পারে স্বাচ্ছন্দ্য, না দেয় শান্তি। এই মূঢ়তা শুধু বাবার নয়, এই মূঢ়তা সমাজে ব্যাপক। তাইতো আমাদের, প্রোলিটারিয়েটদের, একতা আসতে এত দেরি হচ্চে। সবাই আমরা নিজেদের আলাদা মনে করি; অন্যদের পেছনে ফেলে নিজে উঁচু ধাপে উঠে যেতে চাই। এই তো আমাদের দুর্ব্বলতা। পুঁজিবাদী এরই সুযোগ নিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখে। আমরা—সব বঞ্চিত খাটিয়েরা—যেদিন বুঝতে শিখব আমরা সবাই এক আর ওরা আলাদা, ওরা শত্রু, যেদিন সব মজদুর লাল ঝাণ্ডার তলায় মিলিত হয়ে একযোগে…কে, সুবি? চা এনেচিস? নিয়ে আয়।'

সুষমা দুই কাপ্ চা দুই হাতে লইয়া কিছুটা সলজ্জিত মুখে ঘরে ঢুকিল। তর্কের এই উত্তুঙ্গ অবস্থায় ভিতরে ঢুকিবে কি না বুঝিতে না পারিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, অভয় পাইয়া আগাইয়া আসিল। ইতিমধ্যে প্রকাশ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, প্রথমেই তাহার হাতে এক কাপ্ দিয়া অপর কাপটি সে তারাপদর টেবিলের কাছে লইয়া গেল।

'উর্মি কোথায় ? চা তৈরির কাজটা ওকে দিলেই পারিস। অত আল্‌সেমি ভালো নয়।' তারাপদ পেয়ালা গ্রহণ করিয়া সহানুভূতির সঙ্গে কহিল।

'উমা সিনেমায় গেছে।'

'সিনেমায়! কার সঙ্গে ?'

'মেজদা নিয়ে গেছেন।'

'মেজদা বাড়ি এসেচে নাকি ?'

'দুপুরেই এসেচেন।'

'কিছু টাকা বোধহয় হাতে এসেচে। সঙ্গে সঙ্গেই ওড়াচ্ছে।'

সুষমা ইহার কোনও জবাব দিল না, দু' এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করিয়া সে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

প্রকাশ কতক্ষণ হইতেই কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণেও সে পেয়ালায় চুমুক দেয় নাই। সুষমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গলা সাফ্ করিল। কহিল, 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেবেন বলছিলেন। বইটি পাওয়া গেছে কি ?'

সুষমা দরজার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল, থামিয়া পড়িল। ফিরিয়া কহিল, 'না, এখনও খুঁজে রাখা হয়নি। কাল দুপুরে খুঁজে রাখব।'

'আমার কিছু তাড়াতাড়ি নেই।' প্রকাশ ধন্য হইয়া কহিল। 'কি জানেন, মুর্খ মানুষ, একটু লেখাপড়া করে ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হতে চাই। আমার পেছনে তো কোনও কাল্‌চার নেই। যেটা আপনাদের কাছে সহজেই এসেচে, তাও আমাকে কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়। আপনাদের সংস্পর্শে না এলে তাও হয় তো···আচ্ছা দেখুন, আপনাদের উপরতলাটা শুনচি খালি হচ্ছে ?' সুষমাকে চৌকাঠের উপর দিয়া পা বাড়াইতে দেখিয়া প্রকাশ তাড়াতাড়ি কহিল।

'খালি হচ্ছে! আমি জানিনে তো।'

'দয়া করে একটু খোঁজ নেবেন।' প্রকাশ প্রায় আবেদনের সুরে কহিল। 'কোথায় পড়ে আছি, জানেন তো? একেবারে হাঁপিয়ে উঠেচি। অথচ কিছু করবার উপায় নেই। যুদ্ধের মর্শুমে কলকাতা সহরে পাঁচটা চাকরি জোটানো গেছে, কিন্তু একটা বাড়ি জোটাতে হিম্‌সিম্ খেতে হয়। অথচ যেখানে আছি, সেখানে আর কিছুকাল বাস করলে আমি পাগল হয়ে যাব। একটু ভদ্রভাবে থাকবার অধিকার সকলেরই আছে, কি বলেন?...'

প্রকাশের বিনয় ও আচার-আচরণ সুষমার কাছে ভদ্র-জনোচিতই মনে হয়। শুধু তাড়াতাড়ি ভদ্র হইবার এই বাড়াবাড়িটা কিছুটা বালকোচিত এবং হাস্যকর। পোশাকে, কথাবার্ত্তায়, পয়সা খরচের উদারতায় সে ভদ্রতার লক্ষণগুলি বড় বেশি স্পষ্ট করিয়া তোলে। বেচারি যে বস্তিবাসী ইহা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে না, এ-কথা ভাবিয়া সুষমার একটু করুণাও হয়।

'আমি খোঁজ নেব', বলিয়া আর কথা না বাড়াইয়া সুষমা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

'তোকে পরশু যে বইটা দিয়েছিলাম, সেটা পড়া হয়েচে?' সহসা তারাপদ প্রশ্ন করিল।

'বই! কোন্ বই!' চম্‌কাইয়া দরজার দিক হইতে প্রকাশ মুখ ফিরাইল। 'ওঃ, "মার্কসীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি"-র কথা বলচ? না, ভাই, ওটা পড়িনি। সত্যি বলতে কি, বইয়ের নামটা পড়ে আর পড়ার মতো সাহস হচ্চে না। রাগ করো না ভাই। যার যার বুদ্ধির অনুপাতে বই দিতে হবে তো। তুমি যে-সব কঠিন কথা বোঝ, আমি কি তা বুঝি? তোমার ব্রেন্ আর আমার ব্রেন্ এক ক্লাসের নয়।

শত হোক, তুমি যে বংশে জন্মেচ ইন্‌টেলেকচুয়াল্ বৃত্তি তার জন্মগত অধিকার। আমাদের শ্রেণীর পক্ষে…'

'দেখ্, প্রকাশ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না!' তারাপদ বিরক্তির সঙ্গে কহিল। 'এই শ্রেণীভেদের কম্‌প্লেক্‌স্‌টা মন থেকে মুছে ফেলতে না পারলে তোর উদ্ধার নেই। জগতে মাত্র দুই জাতি আছে—এক শোষক ক্যাপিটেলিস্ট, অন্য শোষিত প্রোলিটারিয়েট। এ ছাড়া অন্য শ্রেণীভেদ নিছক কুসংস্কার। তার কোন ডায়ালেক্‌টিক্ ভিত্তি নেই। বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিকের বই পড়ে সমাজের মূল তত্ত্বটা ভুললে চলবে না।…এই জন্যই তোর উপন্যাস পড়ায় আমার আপত্তি। নইলে গোর্কির "মাদারের" মতো বই পডলে কারো কোনও আপত্তিই…'

'তোমার বোনের কাছ থেকে তার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আমি পড়িনি মনে কর?' প্রকাশ সগর্ব্বে কহিল। 'বেশ ভাল। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি ভাই, "দুর্গেশনন্দিনী" পড়ে এমন চমৎকার লেগেচে যে বঙ্কিমচন্দ্রের…'

'ডায়ালেকৃটিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কিছু পড়শুনা না করলে তোর এই ছেলেমানুষি রোমান্টিসিজম্ কিছুতেই দূর হবে না।' হতাশার সঙ্গে এই কথা বলিয়া তারাপদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল; এবং পুস্তকের স্তূপ ঘাঁটিয়া কাস্তে ও হাতুড়ি চিহ্নিত এক বলিষ্ঠ আকারের কেতাব উদ্ধার করিল।

'নে. এটা তাডাতাড়ি পড়ে ফেল।' বলিয়া ধন্বন্তরী ডাক্তারের বড়ির মতো সে প্রকাণ্ড বইটা ভীত ও অনিচ্ছুক প্রকাশের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

প্রকাশের প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাহাকে এমন বিপদে ফেলিতে পারেন, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই! কিন্তু এখন আর উপায় কি?

চার

সেদিন দুপুরবেলা দিদির কাছে একটা নতুন অজুহাত উপস্থিত করিয়া উমা তাহার প্রতিবেশী বন্ধু রমাদের বাড়ি আসিল। রমারা সচ্ছল অবস্থার লোক। তিন পুরুষ ধরিয়া রমাদের বাড়ির লোকেরা জাহাজ কোম্পানীর স্টিভেডরি করিতেছে। একান্নবর্তী পরিবারে লোকবল ও ধনবল কোনওটারই অভাব নাই।

কাছের একটা মেয়ে-স্কুলের নিচু ক্লাসে এক সময় রমা ও উমা উভয়েই একত্র পড়িয়াছে, এই সূত্রেই সখ্যের আরম্ভ। উমা মিশুক, হাসিখুশি লোক। রমা এবং রমার অল্পবয়সী কাকীমারা সবাই উহাকে পছন্দ করে। তার গান শোনে, কাপড়-জামা-গহনা সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করে, তাস বা ক্যারাম খেলে; কখনও বা তাহাকে থিয়েটার, সিনেমায় লইয়া যায়। রমাদের বাড়ির সচ্ছলতার আরাম উমার বড়ো ভালো লাগে। এখানে আসিলে সে যেন স্বাভাবিক বোধ করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটা সহজাত শত্রুতা আছে।

'এই যে, নিজেই এসে পড়েচিস। আয়, আয়। অনেকদিন বাঁচবি।' বলিয়া রমা বসার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া খুশিভরে উমার হাত ধরিল।

উমা মাত্র ভিতরের বারান্দায় উঠিয়া আসিয়াছিল। প্রসন্নমুখে কহিল, 'বাঁচব তোকে কে বল্‌লেরে, রমা? আজকাল জ্যোতিষ শিখ্‌চিস নাকি?'

'তা আর শিখচি না!' রমা সকৌতুকে কহিল। 'জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে, যাকে ডেকে পাঠাবে ভেবেছিলে, ঝি পাঠানোর আগেই

সে যদি সশরীরে এসে হাজির হয়, তবে অতিথি অনেক দিন বাঁচে।...আয়, শীগ্‌গির আয়। ভেতরে চল।'

'কি ব্যাপার!' রমার উচ্ছ্বাসের কারণ না বুঝিয়া উমা চোখের পাতা ঊর্দ্ধায়িত করিল, এবং রমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল।

'বস্,' একবার সবিস্ময়ে নির্জ্জন ঘরের চারদিকে চাহিয়া রমা বন্ধুকে একটা প্রকাণ্ড সোফার উপর ঠেলিয়া বসাইল, 'আমি এই এলাম বলে। দেখি, ছোটকাকীমা শুয়ে পড়েছেন কি না। বিছানায় গিয়ে পড়লে তার আর এক মিনিটও নয়।' বলিয়া ইঙ্গিতে নিদ্রা বুঝাইয়া দিয়া রমা দ্রুত ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

সাধারণত রমার ও রমার কাকীমাদের শোওয়ার ঘরেই তাহাদের আড্ডা বসে। ড্রইং-রুমের পোশাকী আবেষ্টনে মজলিশ জমে না। কিন্তু এ ঘরে বসিলে উমা যেন সমৃদ্ধির স্পর্শ অতি স্পষ্ট করিয়া অনুভব করে। দামি সোফা-কৌচ। নরম রঙিন কার্পেট। দেওয়ালের অয়েলপেন্টিং, কাচের বুক্‌কেসে চক্‌চকে বাঁধান বই, বিচিত্র কারুমণ্ডিত কাঠের ষ্ট্যাণ্ডে মর্ম্মর ও অ্যালাবেস্টারের স্ট্যাচুয়েট্, এ সমস্তই তাহার মনে একটা সম্ভ্রম ও তৃপ্তির উদ্রেক করে। 'আমাদেরও যদি এমন একটা বসার ঘর থাকত!' মনে মনে সে কামনা না করিয়া পারে না।

'না, কেউ জেগে নেই।' রমা মিনিট কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল। উমার পাশে বসিয়া পড়িয়া উমার হাত দুটি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সে বলিল, 'কেন তোকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম, জানিস?'

'তা আমি কি করে জানব?' উমা সখীর আগ্রহাতিশয্যে পুলকিত হইয়া কহিল। 'আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ গণৎকার ছিল বলে জানিনে।

তবে মনে হচ্চে, অনেক কিছুই মনে হচ্চে। এই যেমন, তোর বর ঠিক হচ্ছে, তার সম্বন্ধে আমার…'

'অসভ্য মেয়ে কোথাকার!' বলিয়া রমা কৃত্রিম বিরাগের সঙ্গে উমার হাত দু'টি ঠেলিয়া দিল। 'বরের জন্য তোরই খুব লোভ হয়েচে দেখচি। শোন, তবে কারণটা বলি। কিন্তু অনুরোধ ঠেলতে পারবে না, আগেই বলে দিলুম। যারা গান জানে, তারা এমন ঢঙ্গী হয়…'

'ওরে সর্ব্বনাশ!' উমা কৃত্রিম আতঙ্কের সঙ্গে কহিল। 'গান গাইতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, গাইতে হবে।' রমা গম্ভীর হইয়া কহিল।

'এই দুপুর বেলায়! তা ছাড়া, তোর মা কাকীমারা সব ঘুমিয়েচেন; চিলের গলা শুনে…'

'হয়েচে, হয়েচে লো, নেকী। নিজের গলার আর সুখ্যাত করতে হবে না। সুখ্যাত যা করবার, তা আমিই করে বেড়াই…'

'তোর মত কি আর বন্ধু হয়।' উমা সকৌতুকে কহিল। 'তোর হুকুমে সব করা যায়, গান গাওয়া কোন ছাড়! কি গাইতে হবে?'

'সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা,' রমা খুশি হইয়া উঠিল। 'সেই যে— "রোদন-ভরা এ বসন্ত।"—সবচেয়ে তোর এ গানটাই আমার ভালো লাগে।'

'কিন্তু হঠাৎ রোদন-ভরার কথা মনে পড়ল কেন? আর তা এতই কি জরুরি যে, শোনবার জন্য ঝি পাঠাবার উদ্যোগ হচ্ছিল?'

'ওটা আমার এখনই শোনা চাই।' রমা গম্ভীর হইয়া কহিল। 'কিন্তু আর কৈফিয়ৎ চাইলে মার খাবি। এবার গিয়ে ঐ অর্গ্যানটা খুলে নাও। যত ভালো ক'রে পার, গানটা আমাকে শুনিয়ে দাও। এ ঘরে আমিই একমাত্র শ্রোতা, মনে রেখো; তোর নার্ভাস না হলেও চলবে। উঠলি?…'

'ভালো গাইলে কি পুরস্কার পাওয়া যাবে?' উমা প্রশ্ন করিল।

'তা আগেই বলতে চাই নে।' রমা ভারিক্কি ভাবে কহিল। 'কিন্তু আর দেবি করলে কি পুরস্কার দেব, তা হাতের এ দুটো আঙুলের দিকে তাকালেই বুঝতে আর· '

'কোনই কষ্ট হচ্চে না।' বলিয়া উমা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এ গানটা উমা ভালোই গায়। প্রথমে স্বরলিপি হইতে সুর উঠাইয়া পরে উমা তাহা রেডিও হইতে সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু রমা ও রমার কাকীমাদের মতে, রেডিয়োর প্রচলিত গায়ক-গায়িকাদের চেয়ে এ গানটা তাহার ভালো হয়। কিন্তু এই স্বীকৃতি এই বাড়ি হইতে ইতিপূর্ব্বেই এতবার পাওয়া গেছে যে, আরেক বার, বিশেষত একা বন্ধু রমার কাছে মাত্র গাহিয়া তাহার পরীক্ষা দেওয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু বড়লোক বন্ধু রমার বিভিন্ন মর্জ্জি উমাকে মানিয়া লইতেই হয়। এইবারও সে মানিয়া লইল।

বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গানটা মিনিট দশেক গাহিবার পর উমা অর্গ্যানের ঘাটে কেবলমাত্র সমাপ্তিসূচক টিপুনিগুলি দিয়াছে, এমন সময় একটা সবল হাততালির শব্দ শুনিয়া সে সবিস্ময়ে রমার দিকে চাহিল, কিন্তু সেখানে ইহার উৎপত্তি আবিষ্কার না করিয়া পাশের ঘরের পর্দ্দার দিকে ঈষৎ বিরক্ত, ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টি প্রেরণ করিল। স্পষ্ট বোঝা গেল, কে বা কাহারা পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া এতক্ষণ গান শুনিতেছিল, গান সমাপ্ত হওয়ামাত্র হাততালি দিয়া উঠিয়াছে।

'কে, ছোটকাকীমা?' উমা অর্গ্যানের টুল হইতেই রমাকে প্রশ্ন করল।

'না।'

'তবে?'

'দেখাচ্ছি।' বলিয়া রমা সোফা হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে ঢুকিল, এবং পরক্ষণেই তার পিসতুত ভাই সিনেমা-ডিরেক্টর নরেন বর্দ্ধনের হাত ধরিয়া প্রায় হিঁচহিড় করিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া আসিল। কৃত্রিম তিরস্কারের সঙ্গে কহিল, 'তুমি এমন চোর! পরের বাড়ির মেয়েদের গান ফাঁকি দিয়ে শুনে নাও, এ কি রকম আচরণ! তারপর বল, বাজি হেরেছ কি না। তোমার হাততালি তোমার পরাজয় ঘোষণা করেছে, ন'দা; এখন প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে চেষ্টা করো না।'

'না, তা করব না। সত্যিই হেরেচি।' বলিয়া নরেন উমার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে নমস্কার জ্ঞাপন করিল। 'একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হলো বলে মাফ্ করবেন, উমা দেবী। আজ এদের বাড়িতে এসেই রমার সঙ্গে আমার একটা বাজি ধরাধরি হয়ে গেছে। আমার নতুন ফিল্মে "রোদন-ভরা" গানটি একজন বিখ্যাত গায়িকা প্লে-ব্যাক্ করেছেন। ছবি রিলিজের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে রেকর্ডটিও রিলিজ্ হবে। কিন্তু একটা রেকর্ড আমি আগাম নিয়ে এসেছি। রেকর্ড শুনে আপনার বন্ধু বললেন, "উমা এ গানটা এর চেয়ে ভাল গায়।" আমি বললাম, তা বৈ কি। এ গান গেয়েচে বিখ্যাত গায়িকা অমুক। তখনই বাজি ধরাধরি হয়ে গেল; পাছে আপনি আমার সামনে গাইতে রাজি না হন, বা প্রতিযোগিতার কথা শুনে আপনার খাঁটি ফর্ম্ম প্রডিউস্ করতে না পারেন, এজন্যই এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিতে হয়েছে। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।'

'আর বাজি হারা সম্বন্ধে?' রমা প্রশ্ন করিল

'সম্পূর্ণ হার স্বীকার করছি।'

'বাজি হারলে কি দেওয়ার কথা আছে?'

'দু' ডজন সুইস পেস্ট্রি, দু' ডজন মুর্গি প্যাটিস্।'

'কখন পাচ্ছি ?'

'গাড়ি প্রস্তুত। যদি রাজি থাকো, এখনই নিউ মার্কেট থেকে নিয়ে আসতে পার।'

'খুব প্রস্তুত।' রমা কহিল। 'তোমাদের সিনেমা-অলাদের কথায় বিশ্বেস নেই। দেরি করলে মারা যেতে পারে।—চল্ উমা, তুইও চল্।'

'আমি!' উমা সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল। 'আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি।'

'তা হলোই বা! কতক্ষণের আর ব্যাপার। আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট বৈ তো নয়। বাড়ির কে আর জানছে বল।' বলিয়া রমা উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কাপড়টা বড় ময়লা, আমি বদ্‌লে আসি। তুমি তোমাদের বিখ্যাতার রেকর্ডটা উমাকে একটু শুনিয়ে দাও না, ন'দা। আমার পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না।'

রমা কাপড় বদ্‌লাইবার জন্য প্রস্থান করিবার পর নরেন কিন্তু সহসা রেকর্ড বাজাইবার কোনও উদ্যোগ করিল না। প্রশংসার দৃষ্টিতে উমার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া সে কহিল, 'সিনেমায় প্লে করার কথা কি আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন ?'

'না।' উমা কহিল।

'কি গলার দিক দিয়ে, কি চেহারার দিক দিয়ে ফিল্মে অভিনয় করবার পক্ষে আপনার সকল রকম উপযুক্ততা আছে।···বাড়িতে আপত্তি হবে বুঝি ?'

'হাঁ, নিশ্চয়ই হবে।' উমা প্রসঙ্গটায় কিছুটা ভীত এবং কিছুটা পুলকিত হইয়া কহিল। 'আমাদের বাড়ির লোকেরা খুব সেকেলে মানুষ। তারা এ সব খুব মন্দ···'

'কত ভদ্রবাড়ির সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তো আজকাল ফিল্মে নামচেন।' নরেন উমার দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া কহিল। 'স্কুলে শিক্ষয়িত্রীগিরী, অফিসে কেরাণীগিরী করার চেয়ে এ কাজ মন্দ কি? মেয়েদের যদি কাজ করতেই হয়, তবে যেটাতে আয় বেশি সেটাই তো করা ভালো।...আপনি বাড়ির লোকদের একবার সাউণ্ড্ করে দেখতে পারেন। আমার হাতে একটা কাজ আছে। শীগগিরই হয় তো আমার একজন হেরোয়িনের দরকার হবে। আপনাকে যদি পাওয়া যায়...আপনি কখনও স্কুলে প্লে করেচেন?...'

'খুব। কিন্তু সে হলো ইস্কুলের প্লে। তাতে কি হবে?' উমা কহিল।

'নিশ্চয়ই হবে।' নরেন উৎসাহ পাইয়া জোর দিয়া কহিল। 'এ অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোন ক্ষতি হতো না। আপনাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনই আপনার সম্ভাবনা আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। কথাটা ভেবে দেখুন। যদি গার্জ্জিয়ানকে রাজি করাতে পারেন...'

'ওরে সর্ব্বনাশ! তা হবে না,' উমা কহিল। 'একেবারে মেরে ফেলবে।. তা ছাড়া, আমি ওসব হতেও চাইনে।' উমা সাবধান হইয়া উঠিল।

'তা তো ঠিকই।' নরেনও হুঁসিয়ার হইল। 'নিজের ইচ্ছে না থাকলে তো কথাই নেই। গার্জ্জিয়ানদের প্রশ্ন নিজের বিশেষ আগ্রহ থাকলে তবেই ওঠে। আমি শুধু এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে, সিনেমা লাইন অন্য লাইনের চেয়ে কিছু নিন্দনীয় নয়, অথচ অনায়াসেই মাস্টারির দশ-বিশগুণ আয়...হয়ে গেল সাজসজ্জা, রমাদেবী! সামান্য কুড়ি-পঁচিশ মিনিটও লাগে নি...'

'তা বৈ কি!' রমা ফোঁস্ করিয়া উঠিল। 'নিজেদেব যেন সাজ করতে কম সময় লাগে। আজকাল ছেলেরা তোমরা যা সাজ, তিনটে মেয়েতেও তা সাজে না!' বলিয়া সে নরেনের সাজের দিকে নজর করিল।

নরেন সুপুরুষ লোক। মুখটা একটু গোল ধরণের, নাকের তলায় গোঁফের রেখায় সযত্ন পরিচর্য্যার লক্ষণ আছে। গায়ে টাই-হীন শার্টের উপর গ্যাবার্ডিনের কোট; পরণে নীল্‌চে কর্ড্‌রয়ের ট্রাউজার্স! পায়ে ডুরাটা সোল্‌-এর মোটা দামি জুতো। হাতের আঙুলে দু'তিনটা গ্রহরত্নের আংটি। চুল ব্যাক্‌ব্রাশ্ করা।

'তোমরা যেমন সবলা হয়ে উঠছ,' নরেন সকৌতুকে কহিল, 'তাতে ক্রমে সাজবার ভারটা হয় তো পুরুষদেরই নিতে হবে। কিন্তু এখনও তার বাকি আছে।...তবে আর দেরি কেন, উঠে পড়া যাক্... চলুন. উমা দেবী। কতক্ষণের আর ব্যাপার। অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ না করে' আমি খুব জোরে গাড়ি চালাতে পারি...'

উমা জানে, দিদি শুনিলে রাগ করিবে, কিন্তু মোটরের জন্য তাহার দুর্ব্বলতাও প্রচুর। অন্য যাত্রিদের জন্য ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্টপে দাঁড়াইবার প্রয়োজন-হীন যথেচ্ছ ছুটিয়া বেড়াইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাহার অবচেতন মনে সুপ্ত আছে, সুযোগ পাইলে তাহা দুর্ব্বাধ্য হইয়া ওঠে।

নরেনের নিচু সিড্রোয়াঁ গাড়ির সামনের আসনেই তিনজনে আঁটিয়া গেল।

রমা কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কহিল, 'তোমার সঙ্গে যাওয়া এক মস্ত বিপদ।'

'কেন, আমার দোষ কি?' নরেন প্রশ্ন করিল।

'যেই দেখবে, সেই ভাববে, আমরা সিনেমা স্টার।'

'তাতে ক্ষতি কি।' নরেন অবিচলিত ভাবে কহিল। 'আমি তো তোর বন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, মেয়েদের অন্য আর পাঁচটা প্রফেশানের চেয়ে সিনেমা-অভিনেত্রীর প্রফেশান্ এমন কিছু খারাপ নয়, অথচ এতে আয়…'

'কত আয়?' রমা প্রশ্ন করিল। 'ধর, উমা যদি সিনেমায় নামে, কত টাকা পাবে? আমার কথা ছেড়ে দিলাম। আমাকে কেউ পছন্দ করবে না জানি…'

'ওকে প্রথমেই একেবারে হেরোয়িন করে নামানো যায়।' নরেন সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল। 'তা হলে প্রথম ছবিতে, ধর, মাসে পাঁচ শো! তারপর উৎরে গেলে পরের ছবিতে আট, দশ, পনেরো, কুড়ি যে কোনও অ্যামাউন্ট্ হ'তে পারে…'

'কি রে উমা নামবি?' রমা রগড়ের সুরে কহিল। 'যদি নামতিস্ তবে ওদের খ্যাতনামা গায়িকার মতো ওদের খ্যাতনামা তারকাদের জ্যোতিও নিবুনিবু করে' দিতে পারতিস, এ আমি জোর করেই বলতে পারি।'

'তা আমিও পারি।' নরেন কহিল।

পাঁচ

দিনের কাজকর্ম্মের শেষে প্রত্যহই প্রকাশ সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া পরিষ্কার হয়, তা কি শীত, কি গ্রীষ্ম। আজও সে প্রথামত নাহিয়া আসিয়া নিজের ঘরের মাটির দেওয়ালে আটকানো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দামি চিরুণী দিয়া ভিজা চুল আঁচড়াইতেছিল।

মাথায় একটু গন্ধ দেওয়া এবং মুখে একটু স্নো ঘষা তার দুর্ব্বলতা; কিন্তু আজ এই প্রসাধন সে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিল। একটু পরেই তারাপদর আসিবার কথা। তারাপদ এ সব পছন্দ করে না, বলে, 'মেয়েলিপনা!'

তাহার এখানে তারাপদ না আসিলেই প্রকাশ খুশি হয়। বন্ধুত্ব সত্ত্বেও প্রকাশ তারাপদকে বিশেষ সমীহ করিয়া থাকে। তারাপদর মধ্যে একটা নেতৃত্বের ভাব আছে; কিন্তু তাকে নিজের বাড়িতে আনার সঙ্কোচ তার জন্য নহে। সঙ্কোচের কারণ বস্তির বাড়িটা। তারাপদর নেতৃত্ব প্রকাশ অনেক দিন আগেই মানিয়া লইয়াছে। তারাপদকে 'আপনি' স্থলে 'তুমি' বলিতে প্রকাশকে কম মেহন্নত করিতে হয় নাই। তারাপদ পীড়াপীড়ি না করিলে সে তাহাকে 'তুমি' বলিতে সাহসই করিত না। তারাপদ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক, এটা প্রকাশের পক্ষে ভোলা কঠিন। প্রকাশের মা তাহাদের অতীত সচ্ছলতা সম্বন্ধে গর্ব্ব করেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা যে নিম্নশ্রেণীর ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বস্তির এই ঘরগুলি যেন নিরন্তর প্রকাশের কৌলীন্যাভাবের দিকে আঙুলনির্দ্দেশ করিয়া দেখায়। বস্তির পুরোভাগে, প্রায় গলির মুখেই, তাদের দুটি মাট-কোঠা। বস্তির অন্যান্য বাড়িগুলি

হইতে এই দুটি ঘর স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহাদের আওতার বাহিরে নয়। প্রকাশের ঘরে বসিয়াই বস্তির খ্যান্‌খেনে হার্ম্মোনিয়াম ও কলহের মিশ্রিত শব্দ শোনা যায়; তাহার ঘরের সামনে দিয়াই বস্তির বারবিলাসিনী বাহির হইতে সন্ধ্যার শিকার সংগ্রহ করিয়া ফেরে। তাড়ি-খাওয়া ছুতার ব্রজবিলাস যখন তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রাত্যহিক ঠ্যাঙানি শুরু করে, তখন মেয়েটার আর্ত্তনাদ রোজই প্রকাশের জানালা দিয়া পূতিগন্ধময় নর্দ্দমা ও নিজ নিজ গণ্ডী হইতে ঝাঁটাইয়া-ফেলা আবর্জ্জনার স্তূপের ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে।

ইহাতে যে প্রকাশের খুব একটা অসুবিধা হয়, তাহা নহে। এখানে থাকিতে থাকিতে এগুলি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; অনায়াসে সে এ সকল উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের জীবনের সঙ্গে এগুলি যে বেখাপ্পা, এই উপসর্গগুলির উপর দিয়াই যে উচ্চ ও নিম্ন-শ্রেণীর সীমারেখা টানা, ইহা সে বুঝিতে শিখিয়াছে। এ জন্যই তারাপদ তার বাড়িতে আসিলে তার সঙ্কোচ হয়। গ্যারেজে তারা একশ্রেণীর লোক, একই কাজ করে। তারাপদ এখানে আসিলে বিভেদটা বড় রূঢ় ভাবে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

'রান্না হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নে না, বাবা।'

প্রকাশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চম্‌কাইয়া পিছনে ফিরিয়া মাকে দেখিল।

'ঠাঁই করে' দেব, খাবি?'

'না না না।' প্রকাশ বিরক্তির সঙ্গে কহিল। 'কদ্দিন বলেচি, সন্ধ্যার মুখে খেতে আমি পছন্দ করিনে, তবু নিত্যি ঐ এক কথা...'

'ঐ দেখ, ছেলের রাগ হলো,' সুরধুনী প্রশ্রয়ের সঙ্গে কহিল। 'কেন, খেলে দোষটা কি? আগে চিরদিনই কাজ থেকে ফিরে...'

'তা হোক্ গে।' প্রকাশ গম্ভীর ভাবে কহিল।

বেচারি মা! ভদ্রলোকের রীতি সে কিছুই জানে না!

'খাবার ঠাণ্ডা করে' খেতে কি ভালো?' সুরধুনী আবেদনের কণ্ঠে কহিল। 'একবার উনোন নিবোলে আর তো গরম করে' দেবার উপায় নেই…'

সুরধুনীর বয়স বছর পঞ্চাশ। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-শ্রেণীর স্ত্রীলোকের লক্ষণগুলি তার মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট। দেহের বাঁধুনি আঁটো, হাতের পেশী সবল, মুখের চোয়াল শক্ত। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি সদয় ও স্নিগ্ধ।

প্রকাশই তাহার একমাত্র সন্তান। দশ বৎসর আগে স্বামীর মৃত্যু হইলে একদল ইতর গ্রামবাসীর দৌরাত্ম্য এড়াইবার জন্য তাহাকে কলিকাতায় পালাইয়া আসিতে হয়। প্রকাশ তখন হাই স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। প্রকাশের বাবা জমিদারের কাছারির তহশিলদার ছিলেন; কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন। সুরধুনীর কিছু সোনারূপার গহনা ছিল। ইহাই হইল তাহাদের একমাত্র ভরসা। তখন হইতেই মাতা-পুত্রের বস্তিবাস শুরু হয়। মাটির ঘরে থাকা কোনও দিনই কষ্টকর মনে হয় নাই; কিন্তু গ্রামের মাটির ঘরের সঙ্গে বস্তির মাট-কোঠার তফাৎ যে অনেক, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। কিন্তু বস্তির বাহিরে যাইবার সঙ্গতি ছিল না। কিছু বা মূলধন ভাঙিয়া, কিছুটা বা গরুর ও ছাগলের দুধ বেচিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া সুরধুনী সংসার চালাইয়াছে। ইহার পরে প্রকাশ ম্যাট্রিক পাস্ করিল, এবং মিথ্যা কিছুকাল চাকরির চেষ্টা করিয়া অবশেষে সে এক মোটর-গ্যারাজে শিক্ষানবিশ হইয়া ঢুকিল। এখানে বছর দু-তিন প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ শিখিয়া তবে সে উপার্জ্জন শুরু করে।

'আচ্ছা, মা, আমাদের একটা ছোক্‌রা রকমের চাকর রাখলে কেমন হয়?' সহসা প্রকাশ কহিল।

'চাকর!' সুরধুনী অবাক হইয়া কহিল। 'চাকর দিয়ে কি হবে? মাত্র দুজনার কাজ, তাও আমি নিজে পারব না? কত গণ্ডার আমি একা…'

'তা হোক,' প্রকাশ শান্ত ভাবে কহিল। 'তোমার তো বয়স হচ্চে। এখন যদি তোমাকে একটু বিশ্রাম দিতে না পারি, তবে মিছে কেন খেটে মরচি…'

'কেন', সুরধুনী সবিস্ময়ে কহিল, 'ভুতির মা তো রোজই দুবেলা এসে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে যাচ্চে। এই কি কম আরাম! জীবনে আমাকে এ আরাম কে দিয়েছে, বাবা?' বলিতে বলিতে সুরধুনী আঁচল দিয়া দুই চোখ মুছিয়া লইল।

'তা হোক্ গে', প্রকাশ তোরঙ্গের উপর জড়ো-করা ধোপ-ফেরত কাপড়গুলি হইতে একটা শার্ট তুলিয়া গায়ে পরিতে পরিতে কহিল, 'একটা ছোক্‌রা-চাকর থাকলে রাতের রান্নাটা সেই করতে পারবে। তোমাকে আর…'

'না, না, ওতে আমার কোনও কষ্ট হয় না', বেহিসাবী ছেলেকে এ-বিষয়ে আস্কারা দিতে অনিচ্ছুক হইয়া সুরধুনী জোর দিয়া কহিল, 'বেশ তো, তোর রাত করে খেতে ইচ্ছে, তাই খাস্। কিছু কাঠ-কয়লা এনে রাখলেই…'

প্রকাশ হতাশার ভঙ্গি করিল। কহিল, 'তুমি যদি কিছু বোঝ! ভদ্র হ'তে হলে তাদের চাকর না রাখলে চলে? কিন্তু আমাদের যে গোড়ায়ই গলদ। কাছাকাছি কোথাও দালানের দু'একটা কোঠাও পেতাম, তবে এই লক্ষ্মীছাড়া বস্তিটা ছাড়া যেত। যদ্দিন না বস্তি ছাড়তে পারি, তদ্দিন কিছুই হবে না, ছোট হয়েই থাকতে হবে।

অথচ যুদ্ধের পর থেকে বাড়ি ভাড়া কি রকম আগুন হয়েছে দেখো। পঁচিশ টাকার ফ্ল্যাটের ভাড়া এখন পঁচাত্তর। বাড়ি পাওয়া গেলেই অত টাকা আমরা পাব কোথায়? অথচ ভদ্রসমাজে মিশতে হলে···'

'থাক, বাবা, আমরা এখানেই বেশ ভালো আছি।' সুরধুনী ক্ষোভহীন কণ্ঠে কহিল। 'এখন ভাত না খেলে কিছু জলখাবার খা। টাট্‌কা মুড়ি ভেজেছি, খাবি?···'

'এখন থাক', প্রকাশ কহিল। 'একটু পরে তারাপদ আসবে। সে এলে একটু চা করে' দিও।···আবার ভাঙা পেয়ালায় দিওনা যেন! নতুন পেয়ালাগুলি নামিয়ে নিও। মুড়ি দিয়ে কাজ নেই। আমি বরঞ্চ বিস্কুট কিনে এনে দিচ্ছি···' প্রকাশ স্যাণ্ডেলে পা ঢুকাইল।

সুরধুনী যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, আবার থামিয়া গেল।

'আর কিছু বলবে?' প্রকাশ মণিব্যাগ পকেটে পুরিয়া প্রশ্ন করিল।

সুরধুনী বিব্রতভাবে কহিল, 'তারাপদ আসচেন, আমি তো জানতুম না। আমি যে নেবুবাগানের ওদের আজকেই আসতে বলেচি। দেনা-পাওনার কথা ঠিক হয়ে গেলেই মেয়ে দেখার ব্যবস্থা···'

'এ-সব কি হচ্চে শুনি?' সহসা প্রকাশের কণ্ঠ গম্ভীর ও তিরস্কার-সূচক হইয়া উঠিল।

'কি আবার হবে।' সুরধুনী কহিল। 'আমার কি ব্যাটার বউ ঘরে আনতে ইচ্ছে করে না? শুনেছি মেয়ে সুন্দরী, দেবে থোবে ভালো। বউবাজারে বাপের বড়ো মুদিখানা আছে···'

'আমাকে মোটে জিজ্ঞেস না করে এসব কথাবার্ত্তা চালাবার মানে?'

'শোন ছেলের কথা!' সুরধুনী আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল। 'আগে কথাবার্ত্তা ঠিক হবে, কুষ্ঠি-ঠিকুজি মিলবে, তবে তো তোকে

বলব। তবে তো মেয়ে দেখা হবে। তোর অমতেই কি আর বিয়ে হবে…'

'যথেষ্ট হয়েছে।' প্রকাশ গম্ভীর ভাবে কহিল। 'এবার এসব বন্ধ কর।'

'সে কি কথা রে। বয়স হয়েছে, এবার বিয়ে-থা করতে হবে না?' সুরধুনী স্তম্ভিত হইয়া কহিল।

'না,' প্রকাশ জেদের সঙ্গে কহিল। 'গরিবের বিয়ে করার অধিকার নেই, তাতে দারিদ্র্য বাড়ে, নতুন মানুষকে দুঃখ আর অভাবের মধ্যে টেনে আনা হয়, গরিবের সংখ্যা বেড়ে ওঠে…'

সুরধুনী ছেলের কথার মাথামুণ্ডু স্থির করিতে পারিল না। এমন কথা সে জীবনে শোনে নাই। প্রকাশের যুক্তি তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য মনে হইল, কিন্তু সে ঈষৎ প্রতিবাদের সঙ্গে কহিল, 'তা হোক, কিন্তু আমরা এত কি গরিব শুনি? দুবেলা কি পেট ভরে খেতে পাচ্ছি নে? তোর আদ্দেক যাদের আয়, তাদের পরিবারের ছেলেরাও কি বিয়ে করছে না? দেড়শো টাকা ক'জনে মাইনে পায় শুনি? আর এই যে কারখানা খুলেছিস, চালু হলে এ থেকে মাসে এমন কি দু-পাঁচশো টাকা আসতে পারে, তা কি তুই নিজে আমাকে বলিস্ নি?'

'ঐ সঙ্গে এ-ও বলেচি,' প্রকাশ শান্ত হইয়া কহিল, 'এ মোটে চলবে কি না, না তুলে দিতে হবে, এখনও তা বলবার উপায় নেই।' বলিয়া সে ক্ষণকাল চুপ থাকিল। তারপর পুনশ্চ হিসাবে কহিল, 'আর সত্যিই যদি ওটা দাঁড়িয়ে যায়, তবে মুদির বাড়িতে বিয়ে করব কেন, ভদ্রলোকের বাড়িতেই বিয়ে করতে পারি। এদের তুমি ভাগিয়ে দাও, নইলে আমাকে নিয়েই হাঙ্গামায় পড়বে…'

এইবার ব্যাপারটা সুরধুনীর কাছে কিছুটা বোধগম্য হইল।

'বেশ তো, তা যদি মনে করিস,' বোদ্ধার মতো সে কহিল, 'তবে এদের বিদেয় করতে কতক্ষণ। তা বলে বাড়িতে যখন ডেকেচি, অসম্মান করা তো চলবে না। ভদ্রতা করতেই হবে...'

'তবে, বেশ, ভদ্রতা করেই তাদের বিদেয় করো।' প্রকাশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল। 'আমি তারাপদর ওখানে যাচ্ছি। সে আসার আগেই তাকে গিয়ে ধরতে হবে।'

'কিছু খেয়ে বেরুবি না?'

'ওদের ওখানেই চা খেয়ে নেব।'

একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া অবিলম্বেই প্রকাশ তারাপদর বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। একে তো সর্ব্বক্ষণ ও-বাড়িতে যাইতে মন চায়। তার উপর, তারাপদর বস্তিতে আসা আট্‌কাইতে পারাটা স্বস্তির পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নয়। অথচ তাহারা উভয়ে একই শ্রেণীর অন্তর্গত, এই অসত্যটা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তারাপদর জেদের অন্ত নাই।

উভয়-সঙ্কট এড়াইবার সুযোগ পাইয়া প্রকাশ মনে মনে যেন পুলকিত বোধ করিল।

ছয়

রাত সাড়ে দশটা। দুই বোন এতক্ষণ মায়ের খাওয়া তদারক করিয়া এইবার শুইতে আসিয়াছে। দরজায় হুড়কো লাগাইয়া সুষমা শিক্ষয়িত্রীর মতো শাসনের দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিয়া কহিল, 'দেখা। চিঠি দেখা।'

উমা বিছানার কাছে আগাইয়া গিয়া এক টানে বেড্-কভার সরাইয়া দিল। কহিল, 'দেখাবই তো বলেছি, বাপু। অত হাম্বিতাম্বি কেন? যদি নিজে থেকেই না বলতাম, তবে তো টেরই পেতে না!'

'বড় ভালো কাজ করতে!' সুষমা অননুমোদনের সুরে কহিল। 'একদিন তুই বিপদে পড়বি, বলে দিলাম।'

'হয়েছে। যথেষ্ট উপদেশ শুনেছি! এই নাও, হলো তো?' বলিয়া উমা ব্লাউজের ভিতর হইতে একটা খাম বাহির করিয়া দিদির গায়ের দিকে অবহেলাভরে ছুঁড়িয়া দিয়া বেপরোয়া ভঙ্গিতে নিজ বিছানায় গড়াইয়া পড়িল।

বিজ্‌লি আলোটার নিচে সুষমা চিঠি লইয়া গেল। নিঃশব্দে আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। তারপর সেখানে দাঁড়াইয়াই কহিল, 'নিশ্চয়ই তুই আস্কারা দিয়েছিস, নইলে যত বড় বখাটে ছেলেই হোক্, এমন চিঠি লিখতে কখনো সাহস করে!'

'হ্যাঁ, তা বৈ কি। যত দোষ, সবই আমার!' উমা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল।

'এসব ছেলেখেলা নয়,' সুষমা সোদ্বেগে কহিল। 'কি করেছিলি তুই, বল? হেসেছিলি?'

'ধ্যেৎ। হাসতে যাব কেন!' এইবার উমা প্রতিবাদ করিল। 'নষ্টই তো মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। সেদিন তো বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে কায়দা করে' ইসারা করেছিল। আমিও তাই চড় দেখিয়ে নাক বেঁকিয়ে চলে এলাম।'

'চড় দেখালি!' সুষমা সবিস্ময়ে কহিল। 'কি মেয়ে হয়েছিস, বাবা! চড় দেখালে সে তো আস্কারা পাবেই! কি করব তোকে নিয়ে বল তো?...'

'বাঃ রে, ইসারা করবে, আর আমি কিছুটি বলতে পারব না?' উমা ফোঁস করিয়া উঠিল। 'চড় দেখিয়েছি, বেশ করেছি। এবার হলে...'

'তা কর, আর সে আরও বেশি আস্কারা পাক্।' সুষমা চিন্তিত ভাবে কহিল। 'ওসব কিছু করবি না, বলে দিলুম, উমি। মেয়েদের অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। এ পাড়াটা হয়েছে যেমন বাঁদর ছেলেগুলির আড্ডা, আর তুইও হয়েছিস তেমনি একগুঁয়ে। বেশি বাড়াবাড়ি করে তো, হয় ছোড়দা, নয় প্রকাশবাবুকে বলে দিতে হবে...'

উমা সুষমার দিকে আশঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাইল। কহিল, 'হ্যাঁ, ছোড়দাকে বল, আর এই নিয়ে একটা মারামারি কেলেঙ্কারি হয়ে যাক্। দোহাই তোমার, এসব কিছু বলতে যেয়ো না। আর প্রকাশবাবুকে কিছু বলতে হয় তো নিজের কথাই বলো, আমার কথা নয়।' বলিয়া অনাবৃত দুষ্ট হাস্য করিল।

সুষমা প্রকাশ সম্পর্কিত পরিহাসটা গায়ে মাখিল না। কিন্তু উমার এ-ধরণের কথা চলিলে তার প্রায় সন্দেহ হয়, পাড়ার বাঁদর ছেলেদের বাঁদরামিতে উমা রাগ তো করেই না, বরঞ্চ যেন তাহা উপভোগ করে! কে তাহার দিকে চোখের ইঙ্গিত হানিয়াছে, কে তাহার

উদ্দেশে শিষ্ দিয়াছে, রাস্তায় কোন্ ছোঁড়াটা তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে, প্রায় তৃপ্তির সঙ্গেই তাহা সে প্রত্যহ সুষমার কাছে বর্ণনা করে। প্রকাশ্যে এই সব আচরণের প্রতি বিরক্তি জানাইতে উমা কসুর করে না; কিন্তু এসব শুনাইতে তার যে ভাল লাগিতেছে, ইহা আঁচ করিয়া লইতে সুষমার দেরি হয় না।

এই ধরণের বিভিন্ন ঘটনা হইতে সুষমা উমা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসিয়াছে। উমার দোষ যতখানিই হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পুরুষকে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা তার সহজাত। সুষমার চেয়ে উমা যে খুব বেশি একটা সুন্দরী, তাহা নয়। কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে, এমন কোনও লীলা, এমন কোনও ভঙ্গি, এমন কোনও সূক্ষ্ম আবেদন, যাহা বহু পুরুষের মনে সাড়া জাগাইয়া তোলে। সুষমার প্রতি পাড়ার কোনও বদ ছেলে কখনও কোনও অভদ্র ইঙ্গিত করে নাই; কেহ কখনও তাহাকে প্রেমপত্র পাঠায় নাই। প্রকাশ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু উমার প্রতি লোকে যেমন ভাবে আকৃষ্ট হয়, ইহা সে জাতের নহে। হয়ত, সুষমা ভাবে, তাহার গাম্ভীর্য্য ও শালীনতাবোধই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু উমা কি তাহাতেই রক্ষা পাইত? আগুনের শিখার মতো, উমার আকর্ষণী শক্তি নিজের অজ্ঞাতসারেই অন্ধ অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। উমাকে যতটা সে দোষ দেয়, হয়তো বেচারির অপরাধ ততখানি নয়। উমার জন্য সুষমা প্রায় সহানুভূতি বোধ করে।

সুষমা আলো নিবাইয়া গায়ের ব্লাউজ খুলিয়া বিছানায় আসিয়া শুইল।

'আচ্ছা, ভাই দিদি, সিনেমায় নামলে দোষ কি?...'

'অনেক দোষ। এইবার ঘুমো।' সুষমা বিরক্তির সঙ্গে কহিল।

'গরিব হওয়ার মতো এমন দোষ আর কিছুতেই নয়।' উমা না দমিয়া বলিতে লাগিল। 'একবার নিজেদের কথা ভেবে দেখ। কোনও মতে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি ; তার বেশি আর কিছু আমাদের ভাগ্যে জোটে না। যদি এক জোড়া নতুন কাপড় কিনতে হয়, আত্মীয়-স্বজনের বিয়েতে কিছু একটা উপহার দিতে হয়, তবেই বাড়ির আয়-ব্যয়ের মিলে একটা বড়ো রকম ওলোট-পালোট ঘনিয়ে আসে। বাবা চেঁচামেচি করেন, মা কাঁদেন, ছোড়দা ক্যাপিটেলিজম্‌কে গালাগালি করেন, মেজদা হাওয়া হয়ে যান। বাড়িতে যদি কারুর অসুখ-বিসুখ হয়, তবে ডাক্তার আর ওষুধে টাকা ব্যয় করতে হবে ভেবে সবার চক্ষু কপালে ওঠে। এই কি জীবন ? আমাদের বাড়ির বাইরে একবার চেয়ে দেখ, দিদিভাই ? লোকে হাসছে, রগড় করছে, হাওয়া-বদল করতে চেঞ্জে যাচ্ছে, হালফ্যাশানের নতুন জামা-কাপড় কিনছে, গয়না গড়াচ্ছে, মোটরে চড়ে হুঁস্‌ করে' বেরিয়ে পড়ে' ফিরপো-ফ্যারাজিনি থেকে কেক্‌ কিনে আনছে, বক্সে বসে সিনেমা দেখছে, সাহায্যভাণ্ডারে হাজার টাকার চেক্‌ লিখে দিচ্ছে, আসবাবের ভালোমন্দ নিয়ে বিচার করছে, দোকানে গিয়ে ইচ্ছে মত টাকা খরচ করছে, কত খরচ করলে একবারও ভেবে দেখছে না। আর আমরা ? কোনও রকমে বেঁচে আছি। এতেই যেন ধন্য হয়ে গেছি। ইচ্ছেমত দুটো টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে পারিনে। একটা ধনেখালি বা শস্তা রেশমী শাড়ির জন্য পূজার প্রত্যাশায় সারা বছর হাঁ করে' থাকি। কেন, কেন আমরা এ সব সহ্য করব ? কেন আমরা ভালো জামা পরতে পারব না, ভালো খেতে পারব না, ইচ্ছেমত বেড়াতে পারব না, হাওয়া-বদল করতে কখনও শহরের বাইরে যেতে পারব না ? কেন, কেন এমন হবে, শুনি ?…'

'তুই কি ক্ষেপে গেলি, উমি ?' সুষমার কণ্ঠে কোনও ঝাঁজ নাই।

'গরিব হয়ে জন্মালে তাদের কত কিছুতেই বঞ্চিত থাকতে হয়। তবু তো আমরা খেয়ে-পরে...'

'একে তুমি খাওয়া-পরা বল? এ তো জানোয়ারের জীবন!' উমা সপ্রতিবাদে কহিল। 'এ জীবন অসহ্য! এমন করে' আর আমি বাঁচতে পারিনে। ভালো করে' বাঁচবার আমাদেরও অধিকার আছে। যেমন করেই হোক্, এ দারিদ্র্য দূর করা চাই! বাড়িজোড়া এই অভাব দূর করবার জন্য আমি যদি সিনেমায় নামি, তবে...'

'ছি, উমি!' এইবার সুষমা গম্ভীরভাবে কহিল। 'পরিবারের একটা সম্মান আছে তো? সিনেমায় নামলে ছবি দেখে যতই লোকে হাততালি দিক, মনে মনে সবাই নাক সিঁটকোয়। সিনেমার আবহাওয়া কি মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলার পক্ষে অনুকূল?...'

'আমি নিজে যদি ভালো থাকি, তবে কে আমার কি করতে পারে?'

'তা হয় না।' সুষমা সংক্ষেপে কহিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। তারপর সহসা উমা প্রায় মরিয়ার সুরে কহিল, 'বেশ, আমি যদি খারাপই হয়ে যাই, তাতেই বা কি এসে গেল? মাত্র একজন নিজেকে নষ্ট করে' যদি সারা পরিবারকে টেনে ওপরে তুলতে পারে, পরিবারের দুঃখ দূর করতে পারে, তবে তা...'

এক ঝলক সহানুভূতি সুষমার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া আসিল। চঞ্চলা উমা যখন এই সুরে কথা বলে, তখন সুষমা আশ্চর্য্য হইয়া যায়। ইহার মধ্যে চাপল্যের লেশমাত্র আবিষ্কার করিতে পারে না। মনে হয়, সে উমার দিদি নয়, উমাই যেন তার দিদি।

ক্লিষ্টস্বরে সুষমা কহিল, 'বোকা মেয়ে কোথাকার! তাও কখনও পারা যায়? বাবার কথা একবার ভেবে দেখেছিস? আমাদের বংশ বড় বংশ ব'লে কত তাঁর জাঁক। এই তো তাঁর সান্ত্বনা। সান্ত্বনা তুই ভেঙে দিতে চাস্? এমন বংশের মেয়ে গিয়ে যদি সিনেমায় অভিনেত্রী হয়, তাঁর মনে কতটা লাগবে, ভেবে দেখেছিস? এসব পাগলামি ছাড়। আমরা যা আছি, তাই ভালো।'

'বড় বংশ! গুপ্তিপাড়ার দত্ত!' বলিয়া অকস্মাৎ উমা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'এ যুগে জাত ঠিক হয় একমাত্র টাকার অঙ্ক দিয়ে, বেচারি বাবা এত ঘা খেয়েও তা শিখলেন না।'

'চুপ্, অত জোরে হাসিস্ নি। ঘুমের মানুষ জেগে উঠবে।'

'বাবা, বাবা! এত দুঃখে একটু হাসব, তাও তোমার জন্য পারার জো নেই।' বলিয়া উমা নীরব হইল।

আরও মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কাটিল। চারদিক নিস্তব্ধ হইয়াছে। ক্বচিৎ দু'একটা মাতাল অনাবশ্যক চেঁচামেচি করিয়া বস্তির দিকে আগাইয়া যাইতেছে। কখনও এক আধটা নিদ্রালু রিক্সার অলস টুংটাং শব্দ শোনা যাইতেছে। তারাপদ রাত জাগিয়া পড়াশুনা করে, সে-ও কিছুক্ষণ আগে বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়ির বড়ো ঘড়িটা একটু আগে রাত সাড়ে এগারটা বাজিবার সঙ্কেত জানাইয়া আগামী ত্রিশ মিনিটের পথ নীরবে অতিক্রম করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

'দিদি, ঘুমিয়েছিস?'

'কেন?'

'তুই যাই বলিস, আর তাই বলিস, এমন গরিব হয়ে কিছুতেই আমি জীবন কাটাতে পারব না।' উমা বেশ জোর দিয়া কহিল।

'তা বেশ। আমার ঘুম পাচ্ছে।' সুষমার কণ্ঠ নিদ্রা-জড়িত।

'তা বেশ তো! কিন্তু তার উপায় তো কিছু করতে হবে?' উমা অধৈর্য্যভাবে কহিল।

'তার আর ভাবনা কি? তোকে বড়লোক দেখে বিয়ে দিলেই হবে। নে, এবার ঘুমো।'

'তা বৈ কি!' উমা সাভিমানে কহিল। 'কত গণ্ডা রাজা-বাদ্‌শা আমাকে বিয়ে করবার জন্য তাঞ্জাম নিয়ে ছুটে আসছে! গুপ্তিপাড়ার দত্ত! কম কথা হলো!' বলিয়া সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আবার সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'জ্বালালি!' বলিয়া সুষমা পাশ ফিরিয়া ও-কাৎ হইয়া শুইল। আর কোনও সাড়াই দিল না।

সাত

রবিবার কাজের পাট সারিতে সর্ব্বদাই বেলা আড়াইটা তিনটা বাজে। কর্ত্তা সারা সপ্তাহ ধরিয়া নটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া অফিসে দৌড়াইবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে খুব দেরিতে স্নানাহার করেন। ইহার ফলে বাড়ির দৈনন্দিন রুটিন ওলোট-পালোট হইয়া যায়। কাজ-কর্ম্ম সারিতে বাড়ির গৃহিণীর অন্যান্য দিনের চেয়েও দেড়ঘণ্টা দু'ঘণ্টা দেরি হইয়া যায়।

আজ যখন বিরজাসুন্দরী তাহার আবশ্যিক দিবানিদ্রার জন্য শুইবার ঘরের দিকে চলিলেন, তখন পাশের বাড়ির বড়ো ঘড়িতে বেলা তিনটার ঘণ্টা বাজিল। মেয়েরা কেউ বাড়ি নাই; আধ ঘণ্টাটাক আগে হরিপদ দুই বোনকে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া গিয়াছে। ছোট ছেলে তারাপদর এ-দিনে নানা মিটিং ও বক্তৃতা থাকে; দুটোর আগেই সে বাহির হইয়া পড়ে। বাড়িটা খুবই চুপচাপ মনে হইতেছে।

মেজো ছেলে হরিপদ চিরদিনের ভবঘুরে। কিন্তু সম্প্রতি তার ব্যবহারে ও চালচলনে এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, বিরজাসুন্দরী রীতিমত খুশি হইয়া উঠিয়াছেন। এই আধ-ক্ষ্যাপাটে গেঁজেল ছেলেটার প্রতি তার একটা বিশেষ টান আছে; অসুস্থ ও রুগ্ন সন্তানের প্রতি মায়ের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা থাকে। এই পাগ্‌লা ছেলেটাকে স্বাভাবিক আচরণ করিতে দেখিয়া তিনি শুধু আশ্বস্ত নয়, আনন্দিত বোধ করিতেছেন। নিজের মনে হরিপদর বহু দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া নিজের কাছেই বলিতেছেন: "বেচারি, টাকা-পয়সার অভাবে ওর মাথারই ঠিক ছিল না। যেমনি

পয়সা কড়ি কামাচ্ছে, অমনি আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠছে!”

হরিপদ এখনও যে বাড়ি হইতে উধাও না হয়, এমন নয়। তবে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়; অধিকাংশ দিনই সে বাড়ি থাকে এবং বাড়িতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার জবাবদিহি করে। এখন প্রায়ই সে বোনদের সিনেমা দেখায়, এখানে-ওখানে বেড়াইতে লইয়া যায়, এটা-সেটা কিনিয়া দেয়। তাহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। গত সপ্তাহে সে নগদ তু'শো টাকা মায়ের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার ইচ্ছামতো খরচা করো।' ইচ্ছামত টাকা ব্যয় করিবার সাহস বিরজাসুন্দরীর বহুদিন আগেই মরিয়া শেষ হইয়াছে। তিনি গর্ব্বিতভাবে সব টাকাই স্বামীর হাতে আনিয়া দিলেন।

শুইবার ঘরে ঢুকিয়া বিরজাসুন্দরী দেখিলেন, কাশীপতি ইতিমধ্যেই তাহার রবিবাসরীয় নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া খাটের উপর তাঁহার ছোট ক্যাশ-বাক্সটি উঠাইয়া চিঠি লেখায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। শব্দ শুনিয়া ক্যাশ-বাক্সের উপর হইতে চোখ তুলিয়া স্ত্রীর উদ্দেশে কহিলেন, 'তোমার হলো?'

বিরজাসুন্দরী এই অনাবশ্যক প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না; পানের বাটা হাতে খাটের দিকে আগাইয়া আসিলেন। খাটের যে-ধারে বসিয়া কাশীপতি লিখিতেছিলেন, তার উল্টো ধারে মেজেতে পা ঝুলাইয়া তিনি বসিলেন এবং পানের বাটার ঢাক্‌না খুলিতে খুলিতে প্রশ্ন করিলেন, 'কাকে চিঠি লিখছো? মেয়েদের জন্যে সেই চিঠিগুলো আজ লিখে ফেল্‌লে হয় না?...'

'আর লিখছি কি ছাই, তাই তো লিখছি!' বলিয়া কাশীপতি স্ত্রীলোকের উপদেশের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলেন। 'আনন্দ-

বাজারের গত দু'হপ্তার পাত্রপাত্রীর যত বিজ্ঞাপন আমাদের সঙ্গে মানানসই মনে হয়েছে, সব কেটে রেখেছি ; এক এক করে' সবগুলিরই জবাব দিয়ে দেব ভাবছি। জবাব তো কতই দিয়েছি, কি আর লাভ হয়েছে। আজকাল যেমন হয়েচে পাত্রের বাপ, তেমনি পাত্তর নিজে। বংশ-বিচার নেই, লক্ষণ বিচার নেই, সবারই এক মতলব, বিয়ে করে' কতটা দাঁও মারা যাবে! এ কি বিয়ে, না বাজারে সওদা করে' বেড়ানো? অথচ আমার মেয়ে দুটোর মতো উঁচু বংশের সুশ্রী সুলক্ষণা মেয়ে ক'টা পাওয়া যায়, শুনি? পথে ঘাটে এতো তো দেখি, কই...'

'বরাত থাকা চাই তো।' বিরজাসুন্দরী পানে খয়েরের টুক্‌রা গুঁজিয়া কহিলেন।

'বরাত নয় গিন্নী, টাকা।' কাশীপতি সংশোধন করিয়া কহিলেন। 'টাকা থাকলেই সব হয়। তা'হলে আর মেয়ের বিয়ের ভাবনায় এমন নাকানি-চুবোনি খেতে হতো না। কি হচ্ছে, দেখছ তা? চিঠির জবাব আসে না, এমন নয়। মেয়েও দেখে যায়, মেয়ে পছন্দও হয়, কিন্তু আট্‌কায় গিয়ে ঐ টাকায়। যে পাত্তর আমাদের পছন্দ, তার সর্ব্বনিম্ন দাবি-দাওয়া শুনলেও আমাদের হাঁ হয়ে যেতে হয়। অথচ আমারও এমন দুরবস্থা হবার কথা নয়; মেয়ের বিয়েতে আমিও এক আধ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারতুম। কিন্তু যা' ছিল, সব গেছে পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের নজরানা গুনতে। কোন মতে টিকে গেছি, এই বরাত জোর। ভদ্রলোকের কি কম বিপদ। ছোট-লোক হলে স্ত্রীপুত্র নিয়ে রাস্তার লঙ্গরখানায় দাঁড়াতে পারতুম, বস্ত্র-বিতরণের খবর পেয়ে এক জোড়া বস্ত্র মেঙে আনতে পারতুম। কিন্তু তারও জো ছিল না। ভদ্রলোকের সম্মান বজায় না রইলে আর রইল কি? ঐ তো তখন আয়। তারাপদ সবে ম্যাট্রিক দিয়েছে।

দুর্গাপদ হাঙ্গামা দেখে নিজের বৌটি নিয়ে সরে' পড়েছে। হরিপদ গাঁজা-ভাং খেয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। একলা মানুষ, কোন্ দিক সামলাই। যা কিছু জমিয়েছিলাম, সব উবে গেল। এক মানটা ছাড়া আর কিছুই বাঁচাতে পারিনি। এখনও সেই ধারের জের চলছে। ভাগ্যিস তারাপদ একটা যা হোক কিছু করছে, ক'টা পয়সা ঘরে আসছে, নইলে এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে আর বেঁচে থাকতে হ'তো না। আমার যা সঞ্চয় ছিল, তার আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই…'

'তা বললে চলবে কেন,' বিরজাসুন্দরী পান চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন। 'যেমন করেই হোক, মেয়ে পার করতে হবে তো। হরিপদ যে টাকাগুলো দিচ্ছে, ওতে তুমি আর হাত দিও না। হরিপদ তো বলে, ওর আয় আরও বাড়বে ; ক্রমে বাড়ি-খরচার জন্যে আরও টাকা দিতে পারবে…'

'একদিন দুশো টাকা এনে দিয়েছে, আর তুমি গলে গেছ!' কাশীপতি প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিলেন। 'ওটাকে চিনতে আর আমার বাকি নেই। আজ দুশো দিয়েছে, কাল নিজেই এসে দেড়শো টাকা ধার চাইবে ; দু' হপ্তা পরে ওরই কাছে দশটাকা পাওনা দাঁড়াবে। ওর ওপর ভরসা করে' মেয়ের বিয়ে দিতে হলেই হয়েছে।…দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় আমার আর মাথার ঠিক নেই। অন্তত সুষিটাকে পার করতে পারতুম, তবু কিছুটা…'

'তারাপদ একটা কথা বলছিল…'

'কি বলছিল?' কাশীপতি স্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

'বলছিল ওর বন্ধু ঐ প্রকাশ ছেলেটির কথা।' বিরজা শান্ত ভাবে কহিলেন। 'বড়ো নাকি ভালো ছেলে, সৎ ছেলে। অফিসে মাইনে পাচ্ছে প্রায় শ' দেড়েক। তা ছাড়া, ও নিজেই যে

মোটর-মেরামতের কারখানা খুলেছে, তারাপদ বলে, চাই কি এক সেটা থেকেই শীগ্গি মাসে দু-তিন শো টাকা আয় হ'তে পারে। যদি এর সঙ্গে সুষির বিয়ে দেওয়া…'

সহসা একটা সুউচ্চ গর্জ্জনে বিরজাসুন্দরীর অবশিষ্ট কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের জবাব লেখায় নিরত শান্ত কাশীপতি পলকে আগুন হইয়া উঠিলেন। মুখের বিকৃত মাংসপেশীগুলি ত্বকের ঢাকনা সরাইয়া ফেলিয়া আত্মপ্রকাশ করিল, গলার শিরা-উপশিরা ফুলিয়া টান হইল। তিনি প্রায় হুঙ্কার করিতে লাগিলেন: 'এতো বড়ো আস্পদ্ধা! দিনে দিনে কত কি শুনতে হবে! আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বস্তির একটা ছেলের সঙ্গে! আমরা গুপ্তিপাড়ার দত্ত! গরিব হ'তে পারি, কিন্তু এখনও নিচু হইনি। কে এ-সবের আস্কারা দেয় শুনি? তারাপদ? বাজে দলে মিশে তার মাথায় নানা বাজে খেয়াল চাপছে। কিন্তু খবরদার, এ সব চলবে না। এসব আমি বরদাস্ত করব না। এখনও আমি বাড়ির কর্ত্তা…'

বিরজাসুন্দরী ইহার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। একে তো তারাপদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর কোনও মতামত ছিল না; তাহার উপর, ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি ভালো করিয়াই শিখিয়াছেন, কাশীপতি চটিলে তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিরর্থক; একটু পরে কাশীপতি নিজেই ঠাণ্ডা হইয়া চুপ খাইয়া যাইবেন। তিনি আর কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না; দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার সন্ধানে খাটের উপর পা তুলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

'আমার মেয়ে তো আর ভেসে যাচ্ছে না। আমি হুট্ করে' যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিতে যাব কেন? সমান ঘরে কুটুম্বিতে না

হলে কখনও সুখ হয়?...' রাগ পড়িবার পর মুদ্রিতচোখ স্ত্রীর প্রতি অবশেষে কাশীপতি আপোষের সুরে কহিলেন।

বিরজাসুন্দরী ইহার কোন জবাব না দিয়া বিশ্রামকে আঁকড়াইয়া রহিলেন।

কাশীপতি কয়েক মিনিট ধরিয়া পোস্টকার্ড লিখিলেন এবং বিজ্ঞাপনের কাটিং মিলাইয়া বক্স্ নম্বর ও ঠিকানা বসাইলেন। তারপর স্ত্রীর উদ্দেশে কহিলেন, 'যাই হোক আর তাই হোক, রক্তের গুণ থাকবেই। মেয়ে সদ্-বংশে পড়লে বাপ-মা নিশ্চিন্দি থাকতে পারে। এক টাকাতেই কি সুখ হয়? পাত্তর সম্বন্ধে যখন আগে থাকতে কিছু জানবার জো নেই, তখন ভরসা তোমার এক ঐ বংশ। ভালো বংশের ছেলে হলে তার...ঘুমুলে নাকি? বেচারি! খেটে খেটে হয়রাণ! একটু শুয়েছে কি বেহুঁস হয়ে পড়েছে...'

কাশীপতি আবার পোস্টকার্ড লইয়া পড়িলেন। বাড়ির ব্যাঘাত-হীন নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি তাহার বহু দিনের জমানো কর্ত্তব্যগুলি সারিয়া ফেলিতে চান।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাত আসিল। সদর-দরজার বাহিরে একটা গর্জ্জমান মোটরগাড়ি থামিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বৈদ্যুতিক হর্ণের জরুরি ডাক শোনা গেল। পরক্ষণেই দরজাটায় দ্রুত আঘাত পড়িল।

'মোটরে ক'রে আবার কে এলো!' ঈষৎ বিস্মিত ঈষৎ বিরক্ত-ভাবে কাশীপতি খাট হইতে নামিয়া চটিতে পা ঢুকাইলেন।

দরজা খুলিয়া মেয়েদের দেখিয়া তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন, 'এত তাড়াতাড়িই তোরা ফিরে এলি!' কিন্তু তার বিস্ময়ের বড়ো কারণ পিছনের চলিতে-শুরু-করা প্রকাণ্ড গাড়িটা। জিজ্ঞাসু

দৃষ্টিতে কাশীপতি সেটার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্তানেরা যে এমন গাড়ি চড়িয়া আসিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনাতীত।

হরিপদ সগর্ব্ব খুশিতে দাঁতগুলি বিকশিত করিয়া কহিল, 'প্রমোদবাবু নিজে তার নতুন গাড়িটা করে' পৌছে দিয়ে গেলেন! হাতিবাগানের চৌধুরিদের ছোট তরফের মালিক। আমার ক্লায়েন্ট্।···কি রে উমি, চড়িয়ে আনলুম তো? মাস্টার বুইক্। তিরিশ হাজার টাকা দাম!' ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ের কৃতিত্ব যেন হরিপদর নিজেরই।

হরিপদ যখন মহাউৎসাহ সহকারে দুই বোনকে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়, তখন তার বারের খেয়াল ছিল না। রবিবার চিড়িয়াখানায় প্রবেশের দর্শনী দু আনা হইতে বাড়িয়া এক টাকা হয়। ধনীদের দেখিবার জন্য এই দিনটি নির্দ্দিষ্ট। চিড়িয়াখানার সমুখের টিকিট-ঘরের বাবুটির হাতে হরিপদ যখন অবহেলাভরে তিনটি টিকেটের জন্য ছ' আনা পয়সা গুঁজিয়া দিল, তখন সে ব্যক্তি উপযুক্ত তাচ্ছিল্যভরে তাহা ফেরৎ দিল।

'সুষি, আজকে যে এক টাকা করে টিকেট!' হরিপদ প্রায় বিলাপের স্বরে কহিল। 'আজ রববার, খেয়াল ছিল না। কি মুস্কিল!'

'ঐ তো! তোমার সঙ্গে এলে কিছু একটা ফ্যাঁকড়া বাঁধবেই!' উমা ফোঁস করিয়া উঠিল। 'মিছিমিছি আমাদের নাকাল করতে নিয়ে এলে তো। আর যদি কক্ষনো···'

'কি মুস্কিল!' তারাপদ বিব্রত কণ্ঠে কহিল। 'আমি কি ইচ্ছে করে'···কুছ্ পরোয়া নেই, আমি এনেছি, আমিই ম্যাও সাম্‌লাব। তিন টাকার মামলা বৈ-তো নয়···'

'না না,' সুষমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, 'মিছিমিছি কেন পুরো তিনটে টাকা খরচ করবে। অন্য একদিন এলেই চলবে।... চল না, আজকে যখন এসেছি, তখন হেঁটে এ-পাড়াটা একটু বেড়িয়ে যাই। চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রাস্তাগুলো! বাগানওয়ালা কি সুন্দর সব বাড়ি!...কি বলিস্‌, উমি?' বলিয়া সুষমা হরিপদর অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া উমাকে ইঙ্গিত করিল।

'মন্দের ভালো,' বলিয়া অনিচ্ছার সুরে রাজি হইয়া উমা রাস্তার দিকে আগাইয়া গেল।

ঠিক সেই সময় এক ঘটনা ঘটিল। একটা প্রকাণ্ড নতুন মাস্টার বুইক্‌ গাড়ি উমার পাশে আসিয়া সহসা ব্রেক্‌ চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। গাড়িটার দামি বিলিতি স্যুটপরা সুদর্শন চালক কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করিয়া উমার অসন্তুষ্ট রৌদ্র-আরক্ত গৌরবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা গাড়ির জানালা দিয়া মুখ বাহির করিলেন, এবং উমার প্রায় কাঁধের উপর দিয়া হাঁকিয়া কহিলেন, 'ওহে দত্ত, এখানে কি মনে করে? বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা করতে নাকি?...'

হরিপদ সবিস্ময়ে কহিল, 'আরে, প্রমোদবাবু!' এবং সগর্ব্বে মোটরের কাছে ছুটিয়া আসিল। এত বড় মোটরের মালিক এতগুলি লোকের সামনে তাহাকে নিতান্ত পরিচিতের মতো ডাক দিয়াছেন, ইহার চেয়ে বড় সম্মান আর কি হইতে পারিত!

'চিড়িয়াখানায় তুমি কেন?' প্রমোদ গাড়ি হইতেই কহিলেন। 'ডার্‌উইনের তত্ত্বটা তা হলে নেহাৎ মিছে কথা নয়। আত্মীয়তা জানাতে মাঝেমাঝেই আসো নাকি?...'

'আজ্ঞে না, তা নয়।' হরিপদ বিব্রতভাবে কহিল। 'হলো কি, বোনদের দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। কোথাও তো বের-টের হতে পারে না, তাই ভাবলুম...এই সুষি, উমি, এখানে আয়...'

'এঁরা তোমার বোন বুঝি! এটি বড়ো না ছোট?…'

'এটি ছোট।…সুষি, শোন। লজ্জা করিস্‌ নি। এঁর কথা তো তোদের বলেছি। প্রমোদবাবু আমার মুরুব্বি।'

'মুরুব্বি কি হে, তোমার বন্ধু বল।' বলিয়া প্রমোদ সহাস্থে গাড়ি হইতে নিচে নামিলেন, এবং প্রথমে নিকটবর্ত্তী উমাকে এবং পরে ঈষৎ দূরবর্ত্তী সুষমাকে ভদ্রতাস্থচক বিনীত নমস্কার জানাইলেন।

প্রমোদ চৌধুরির বয়স চল্লিশ একচল্লিশের মতো। হৃষ্টপুষ্ট, ফর্শা সুপুরুষ লোক। গোঁফ দাড়িচাঁছা ভরাট মুখে তৃপ্তির জৌলুষ লাগিয়াই আছে। তাঁহার অর্থ এবং আভিজাত্য সম্বন্ধে কোনও সংশয়ই উপস্থিত হয় না।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরছেন যে?' প্রমোদ উমাকে প্রশ্ন করিল।

হরিপদ কারণ বলিতে উগ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই উমা স্পষ্ট গলায় কহিল, 'আমার খুব মাথা ধরেছে। তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।'

'তবে তো ট্রামে যাওয়া ঠিক হবে না।' প্রমোদ তাড়াতাড়ি সোদ্বেগে কহিলেন। 'চলুন, আমিই আপনাদের বাড়ি পৌছে দিয়ে আসছি।…তুমি তো আমার এই নতুন গাড়িটায় চড়োনি, দত্ত। আলিপুরের বাড়িতে এসে তবেই এটাকে ব্যবহার কবছি; নতুন বাড়ির সঙ্গে নতুন গাড়ির ছন্দ মিলিয়েছি।…আসুন, উঠে আসুন।' বলিয়া প্রমোদ প্রথমে সুষমার ও পরে উমার দিকে চাহিয়া আমন্ত্রণ জানাইলেন।

ইহাই মোটর চড়ার ইতিহাস।

আট

শনিবার অফিস হইতে ছাড়া পাইতে কাশীপতিবাবুর তিনটা বাজিয়া গেল। উমা বাবাকে উলের স্যুয়েটার বুনিয়া দিবে, তাহার উলের ফরমাস আছে। ধর্ম্মতলা স্ট্রীটের কোনও দোকান হইতে কিছুটা শস্তায় উল সওদা করিবার জন্য ডালহৌসি স্কোয়ার হইতে কাশীপতি পদব্রজে যাত্রা করিলেন। কেনা-কাটা সারিয়া এসপ্লেনেড হইতে ট্রামে চড়িবেন। তাতে ট্রাম-ভাড়াও এক পয়সা কম লাগিবে।

উমার প্রতি কাশীপতির একটা বিশেষ স্নেহ আছে। একে তো সে ছোট মেয়ে, তার উপর এ-মেয়েটা আব্দার করিতে জানে, বায়না ধরিতে জানে। সুষমার মতো সে শান্ত, গম্ভীর বা বুদ্ধিমতী নয়; বাড়ির কাজকর্ম্মে সে প্রায় কোনই সাহায্য করে না। ইহাতে কাশীপতি দু'এক সময় রাগ প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহাকে ছোটমেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ বলিয়া তিনি এবং বাড়ির সকলেই মানিয়া লইয়াছে। সে-মেয়েই যখন নিজে যাচিয়া বাবার জন্য স্যুয়েটার বুনিবার প্রস্তাব করে, তখন পরম আনন্দে ও কন্যা-গর্ব্বে কাশীপতির মন ভরিয়া উঠে। অন্য সময় হইলে খরচের কথায় তিনি চটিয়া উঠিতেন, বিশেষত তাঁহার নিজের জন্য খরচের এমন প্রস্তাব অনুমোদন করিতেন না। কিন্তু পিতার প্রতি উমার দরদের এমন পরিচয় পাইয়া তিনি পুলকিত হইয়াই উল আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে এসপ্লেনেড ঈস্ট ধরিয়া তিনি বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে উপস্থিত হইলেন। পুলিশ হাত তুলিয়া লওয়ায় সম্প্রতি

এই পথে ট্রাফিকের স্রোত উদ্দাম হইয়াছে। কাশীপতিকে অপেক্ষা করিতে হইল। কোনও তাড়া দিল না; আজই উল্ কিনিয়া দিতে হইবে, এমনও কোনও কথা নাই। ভবানীপুরের তুলনায় দাম অন্তত দু'এক পয়সা শস্তা না হইলে মোটেই হয়তো কিনিবেন না। পকেটের মণিব্যাগের প্রতি সকল সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তিনি যান-প্রবাহে ভাঁটা পড়িবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

'কে? কাশীবাবু না?'

কাঁধে একটা হাত পড়িতে কাশীপতি চম্‌কাইয়া পাশে তাকাইলেন।

'যাচ্ছেন কোথায়? খবর সব ভালো তো?'

'এই যে সতীশ—' কাশীপতি সসম্ভ্রমে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিলেন, এবং সামান্য দ্বিধা করিয়া পুনশ্চ হিসাবে ভদ্রলোকের নামের পিছনে 'বাবু' জুড়িয়া দিলেন। 'অনেক দিন পরে দেখা হ'ল...'

সতীশ লাহিড়ীও একসময় বার্ড, এডওয়ার্ড অ্যাণ্ড জন্‌সন্ কোম্পানীতে কাজ করিত। টুল্‌স্ অ্যাণ্ড মেসিনারিস্ বিভাগে সে সেকেণ্ড ক্লার্ক ছিল। য়ুনিয়নের উগ্র পাণ্ডাদের সে-ছিল অন্যতম। কাশীপতিবাবুর 'রায় বাহাদুর' নাম সে-ই প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। অফিসের সাহেবেরা তার উপর খুবই খাপ্পা, কিন্তু তার পিছনে য়ুনিয়ন আছে; ইচ্ছা করিলেই তাকে তাড়ানো যায় না। এমন সময় সুযোগ মিলিল। য়ুনিয়নের টাকা তছ্‌রূপের অভিযোগে য়ুনিয়ন তখন সতীশকে অস্বীকার করিয়াছে; মৌকা বুঝিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের কারণ আবিষ্কার করিলেন। সতীশ লাহিড়ীর চাকরি গেল।

ইহা শাপে বর হইল। সতীশ লাহিড়ী তার এক ভগ্নীপতির টাকায় ব্যবসায় নামিল। সেটা ১৯৪০-৪১ সাল; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে দ্রব্যমূল্য কেবল বাড়িবার লক্ষণ দেখাইতেছে। সতীশের ছোট-খাটো যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল; সে কয়েক ডজন ইলেকট্রিক মোটর ও লেদ্, কয়েক কুড়ি ড্রিল, হ্যাক্‌স-ব্লেড্ ও প্লায়ার, বিস্তর দরজা-জানালার কব্জা, কয়েক হন্দর স্ক্রু, নাট্ ও বল্টু কিনিয়া মজুদ করিল। শীঘ্রই ইহা হইতে অবিশ্বাস্য রকম মোটা লাভ হইল। উঠ্‌তির বাজারে এই ব্যবসা করিয়া ক্রমে সে আরও টাকা উপার্জন করিল।

ইহার পর আসিল মিলিটারি কন্‌ট্রাক্ট, সৈন্যদের জন্য খাদ্য ও ফার্ণিচার সরবরাহ। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল অ্যামোনিয়া সাল্‌ফেট, ক্যস্‌টিক সোডা, চিলিয়ান নাইট্রেট, এসেন্‌শিয়াল অয়েল, সোপ্ স্টোন্ প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় কেমিক্যালের ব্যবসা। সতীশ লাহিড়া প্রায় রাতারাতি বেলুনের মতো ফাঁপিয়া উঠিল।

সমৃদ্ধির এই জোয়ারের মুখে সতীশের সঙ্গে কাশীপতির একবার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের সদর-দরজার মুখে দেখা হইয়াছিল। সতীশের সঙ্গে ছিল দুইজন মার্কিণ সামরিক অফিসার। সেদিন সতীশ কাশীপতিকে দেখিয়াও চেনে নাই; মুখ ফিরাইয়া, সঙ্গীদ্বয়ের সাথে গল্প করিতে করিতে, পাইপের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে হোটেলের লবীতে ঢুকিয়া গিয়াছিল।

সেই সতীশ লাহিড়ী আজ নিজে যাচিয়া কাশীপতির সঙ্গে কথা বলিতেছে। সে-দিনের উপেক্ষায় কাশীপতি যেমন চটিয়াছিলেন, হঠাৎ-বাবুদের প্রতি নিজের কাছে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন, আজ আবার তিনি তেমনি প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

'তোমাকে পায়ে হেঁটে চলতে দেখব, এমনটি তো কখনও ভাবিনি।' কাশীপতি রসিকতার চেষ্টা করিয়া কহিলেন। 'শুনেছি, সকালে-বিকেলে একই মোটরগাড়িতে তুমি চড়ো না।'

'শুনেছেন বুঝি!' পাইপের ধোঁয়া ছাড়িয়া সতীশ কহিলেন, 'তবেই বুঝতে পারছেন, লোকে বন্ধুদের সম্বন্ধে কত মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে বেড়ায়। এ-দিকে চলেছেন কোথায়? অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও আপনার গতিবিধি আছে, তাতো আমার জানা ছিল না।'

'না, বিশেষ কোনও কাজ নেই।' কাশীপতি বিব্রত হইয়া কহিলেন, 'মেয়েরা কিছু জিনিষপত্রের কথা বলে দিয়েছিল, ভাবলাম, যাই, কিনে নিয়ে যাই।'

'আমাদের উদ্দেশ্য তবে অভিন্ন।' সতীশ সহাস্যে কহিলেন, 'আমিও গিয়েছিলাম কিছু গরম কাপড়ের সন্ধানে, কিন্তু পছন্দ হলো না। দু' একটা সাহেবী-দোকান দেখবার মতলব ছিল, কিন্তু আজ শনিবার, এতক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে···অনেক দিন পরে দেখা! চলুন, কোথাও একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।··· আপনারা হলেন পুরোনো বন্ধু···' বলিয়া সতীশ একদিকে ফিরিয়া মুখটা উঁচু করিয়া ডান হাত তুলিয়া রাস্তার দিকে তুড়ি দিল।

হতভম্ব কাশীপতি এই অদ্ভুত আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিবার পূর্ব্বেই একটা মস্ত চক্‌চকে মোটরগাড়ি তাহাদের সম্মুখে হাজির হইল এবং পরক্ষণেই জাঁকালো উর্দ্দিপরা গাড়ির চালক গাড়ি হইতে নিচে নামিয়া তাড়াতাড়ি পিছনের আসনে পৌছিবার দরজা খুলিয়া ধরিল।

'আসুন!' কাশীপতিকে আকর্ষণ করিয়া সতীশ কহিলেন।

কাশীপতি প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গদির আসনে সসম্ভ্রমে আসীন হইবার পর তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলেন, 'একটু কেনা-কাটার ছিল···'

'সে পরে হবে'খন, আজ না হয় তো কাল হবে।' সতীশ পাশে আসিয়া বসিলেন। 'চলুন, আজ পুরোনো দিনের গল্প করা যাক। আমার হাতে কোনও কাজ নেই···' এবং কাশীপতির অপেক্ষা না করিয়া শোফারের প্রতি কহিলেন, 'ফিরপো···'

'ফিরপো!' কাশীপতি এতক্ষণে প্রকৃতই ঘাবড়াইয়া গেলেন। 'না, না, ওসব জায়গায় আমি কেন! মানে, বুঝলে সতীশবাবু, ও সব হোটেলে কি আমাদের মতো লোকের মানায়! দেখছ তো জামা-কাপড়ের চেহারা···'

'তাতে কি হলো!' সতীশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিলেন। 'পয়সা দিয়ে খাচ্চি, যেমন খুশি···'

'বুঝছ না,' কাশীপতি প্রায় আবেদন করিলেন, 'মানান বে-মানান আছে তো! তোমাকে যেটা মানায়, আমাকে সেটা···আমার নিজেরই যে অসোয়াস্তি লাগবে। তার চেয়ে বরঞ্চ···'

'আচ্ছা, বেশ, আপনাকে বরঞ্চ আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই চলুন।' কাশীপতির ভীত মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া অবশেষে সতীশ সদয়কণ্ঠে কহিলেন। 'আমার রিজেন্ট পার্কের বাড়ি আপনি তো দেখেন নি, ভালই হলো, সেটাই বরঞ্চ দেখে আসুন।' বলিয়া সতীশ শোফারকে গন্তব্য পরিবর্ত্তন করিয়া সরাসরি বাড়ি ফিরিবার আদেশ দিল।

দ্রুত চলমান গাড়ির আরামদায়ক অভ্যন্তরে স্প্রীংয়ের দোদুল্যমান গদিতে কাশীপতি প্রায় নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। সতীশও দু'চারটি প্রশ্ন-পত্তর করিয়া নীরব হইলেন। কাশীপতির চোখের সম্মুখে চিরদিনের পরিচিত দৃশ্যাবলী যেন ভোজবাজীর মতো দ্রুত চেহারা বদ্‌লাইয়া ত্রস্তে অদৃশ্য হইতে লাগিল। কোনও ট্রাম-স্টপেই গাড়ি থামিল না, নতুন ভিড়ের আমদানি হইল না। জগুবাবুর বাজারের

স্টপে আজ একটা লোকও নামিল না! চারিদিকের সকল কিছুই যেন বদল হইয়া গেছে! পৃথিবীর আবহাওয়াই যেন স্বতন্ত্র। কাশীপতি যেন একটা অজানা উচ্চতা হইতে পৃথিবীকে লক্ষ্য করিতেছেন।

এই মোটর-যাত্রায় কাশীপতির মন এমন আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, সতীশ লাহিড়ীর অবস্থার বিরাট পরিবর্ত্তনের কথা পর্য্যন্ত তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মোটরটা যখন বাঁশধানি রোড হইতে সহসা বেঁকিয়া একটা প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, তখন হঠাৎ তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। রাজপ্রাসাদে তিনি কেন!

সতীশ গাড়ির দরজা খুলিয়া কহিলেন, 'আসুন।'

কাশীপতি বিভ্রান্তের মতো দুইবার হোঁচট্ খাইয়া নিচে নামিলেন।

গাড়ির আওয়াজ পাইয়া দালানের ভিতর হইতে ইতিমধ্যেই উর্দ্দি-পরা বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়াছে, দারোয়ান সসম্ভ্রমে আসিয়া আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছে। সতীশ তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করিয়া কাশীপতিবাবুর হাতের ডানা বিশেষ খাতিরের সঙ্গে আঁকড়াইয়া কাশীপতিসহ মার্ব্বেলের সিঁড়ি দিয়া প্রবেশ-কাম্‌রায় উঠিয়া আসিলেন।

প্রবেশ-কাম্‌রার ডান দিকে সিনেমার সিঁড়ির মতো বিচিত্র ভঙ্গির কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি উপর তলায় উঠিয়া গেছে। তার গায়েই তিন-চারজন লোকের উপযুক্ত একটা ছোট আকারের চক্‌চকে লিফ্‌ট। মেজেটা আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেল পাথরের। সিঁড়ির ডান দিকে কাম্‌রা, বাঁ দিকেও কাম্‌রা; ভিতরের অন্য একটা ঘরে পৌঁছিবার প্রবেশ-পথও এইখানেই। বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিবার দরজা দুটির মাঝামাঝি টুপি, ম্যাকিন্‌টশ্ ও ছাতা-লাঠি রাখিবার স্টাণ্ড। সিঁড়ির পাশে প্রকাণ্ড কাঠের আধারে প্রকাণ্ড বেঁটে পামগাছ।

ডিস্টেম্পার করা দামি দেওয়ালে নানা আকার-আকৃতির ইলেকট্রিক আলোর ঢাক্‌না।

'আপনি এখানটায় একটু বসুন!' জম্‌কালো একটা ড্রইং-রুমে বহুমূল্য একটি কৌচের মধ্যে কাশীপতিকে প্রায় গুঁজিয়া দিয়া সতীশ কহিলেন। 'দু-মিনিটেই আমি এই বিদেশী ছদ্মবেশ খসিয়ে স্বাভাবিক হয়ে নিচ্চি। তারপরই আড্ডা শুরু করব। আপনাকে আজ নিদারুণ যন্ত্রণা না দিয়ে ছাড়ছি নে…'

মিনিট দশেক সেখানে একাকী নিঃশব্দে বসিয়া থাকার পর একটা নেপালী বয়্‌ একটা ট্রেতে চায়ের বিচিত্র সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিয়া কাশীপতিকে এক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া দিয়া, অবিলম্বেই প্রস্থান করিল। কাশীপতি কিছুকাল চা সমুখে লইয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু আর কাহারও আসিবার লক্ষণ না দেখিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। বড়লোকের বাড়িতে চায়ের সঙ্গে কিছু জলখাবার থাকিবে এমন আশা করিয়াছিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'বড়লোকের যত ফুটোনি, সব বাইরে!' তবে চা-টা ভালো। এমন সুগন্ধি চা কাশীপতির বাড়িতে হয় না। কাশীপতি মন্দের ভালো হিসাবে ইহার সদ্‌ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

'সাহেব আপনাকে ওপরে ডাকচেন!'

কাশীপতি চমকাইয়া চোখ উঠাইয়া দেখিলেন, উর্দ্দিপরা একজন বাঙালি ভৃত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এক চুমুকে অবশিষ্ট চা-টুকুন নিঃশেষ করিয়া কাশীপতি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'চল'।

লিফ্‌টের কৌচে বসিয়া কাশীপতি দোতলায় উঠিলেন, এবং ভৃত্যের পিছনে পিছনে নিচের ড্রইং-রুমের দ্বিগুণ বড়ো ও দ্বিগুণ আড়ম্বরপূর্ণ আর একটি ড্রয়িং-রুমের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া

দোতলার অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি খোলা বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে বেতের চেয়ার ও দামি ঢাকনাতে ঢাকা টেবিলে চায়ের বিবিধ সরঞ্জাম ও অজস্র সুখাদ্য চকিতে কাশীপতির নজরে পড়িল। বড়লোকদের কার্পণ্য সম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি প্রায় লজ্জিত বোধ করিলেন।

'আসুন, কাশীবাবু।' সতীশ বেতের হেলান-দেওয়া চেয়ার হইতে কহিলেন। 'বসুন!···একবার গোসলখানায় যাবেন কি? হাত-মুখ বোধ হয় ধোয়া হয়নি···'

'গেলে মন্দ হতো না।' কাশীপতি কহিলেন।

'রাম, বাবুকে গোসলখানায় নিয়ে যা।' সতীশ ভৃত্যকে কহিলেন।

কাশীপতি আবার ড্রইং-রুমে আসিলেন এবং ভৃত্যের নির্দ্দেশমত পাশের কামরায় ঢুকিয়া পড়িলেন।

বাড়ির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কাশীপতি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাথ্-রুমের রূপ দেখিয়া তিনি নিজের চোখকে প্রায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এমন একটা ঘর যদি তার শুইবার কাম্রা হইত, তবে তিনি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। গোসল-খানার মেঝেটা আগাগোড়া রবারে মোড়া; দেওয়াল ইতালীয় টাইল্স্-এর। জানালায় সিল্কের পর্দ্দা। পোর্সেলিনের বিরাট বাথ্-টব। নিষ্কলঙ্ক ওয়াশ্-বেসিনের উপর দেওয়ালে আঁটা ফ্রেম্-হীন পুরু আয়না। ক্রোমিয়ম্প্লেটের চক্চকে কল টিপিলে ইচ্ছামত ঠাণ্ডা বা গরম জল পাওয়া যায়।

অকস্মাৎ কাশীপতির দুই চোখ ঠেলিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিল। লোকের এত আছে! এত তাদের ব্যয়ের ক্ষমতা! তুচ্ছ শৌচাগারকে তাহারা ইন্দ্রপুরী করিয়া তুলিতে পারে। আর তিনি তার

ছেলেমেয়েদের দুটো ভালো জিনিষ খাইতে দিতে পারেন না ; কাপড় ছিঁড়িয়া গেছে বলিয়া মেয়েরা একটা শাড়ি চাহিলে তিনি খেঁকাইয়া ওঠেন। হায় ভাগ্য !

সতীশ পুরোনো দিনের ও তাহার বর্ত্তমানের বহু গল্প করিলেন। কখনও কাশীপতি ভাবিলেন, সতীশ তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির আড়ম্বর দেখাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিবার জন্যই বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়াছে ; আবার কখনও তিনি সতীশের আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি বোধ করিলেন। ভাবিলেন, আমিও যদি তখন চাকরি ছাড়িয়া কোনও কিছু করিতাম ! কিন্তু ছাড়িলেই কি লাভ হইত? সকলেই কি সব পারে ! তা ছাড়া, মূলধনই বা কোথায় পাইতেন ? সতীশের মতো বেপরোয়া হইবার, পুলিশের নাকের তলা দিয়া ব্ল্যাক্-মার্কেট করিবার ক্ষমতা বা দুঃসাহসই কি তাঁর ছিল ?

সতীশ যখন কাশীপতিকে ছাড়িলেন, তখন রাত আটটা বাজিয়াও কিছু বেশি হইয়াছে। সতীশ নিজে নিচে নামিয়া আসিলেন। পূর্ব্ব-পরিচিত শোফেয়ার গাড়ি হাজির করিলে সতীশ কহিলেন, 'না, তোমার গাড়ি নয়। পূরণ সিং-কে তার শ্যাসেট্ গাড়িটা আনতে বল··· গাড়িটা নতুন কিনেছি, একবার চড়ে দেখুন ।'

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কাশীপতি প্রায় আবিষ্টের মতো সন্ধ্যার ঘটনাবলীর রোমন্থন করিতে লাগিলেন। ইহা যেন আরব্যোপন্যাসের ঘটনার মতো কাল্পনিক ঘটনা। সতীশের বেয়ারা একবার মদ্য পরিবেশন করিতে আসিয়াছিল ; সতীশ এক পেগ্ পান করে, কিন্তু কাশীপতি তাহা সভয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এখন কাশীপতির মনে হইল যেন তিনি বহু পাত্র মদ্য পান করিয়াছেন, এবং

ইহার ফলে যে মাদকতার সৃষ্টি হইয়াছে সন্ধ্যার ঘটনাবলী তাহা হইতেই উদ্ভূত।

'টাকার চেয়ে আর বড়ো বংশ-মর্য্যাদা নেই!' তিনি মনে মনে কহিলেন।

সতীশের একটা কথা বারবার তার মনে হাজির হইল: 'জগত টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না, কাশীবাবু। টাকাই মানুষ তৈরি করে। লোকে আমার নিন্দে রটিয়ে বলে, আমি ব্ল্যাক-মার্কেটার! যা ইচ্ছে তারা বলুক, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি বেশ জানি, এক পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে যে কোনও উপায়েই ধনী হইনে কেন, আজ না হোক কাল সারা সমাজ আমার আভিজাত্য মেনে নেবে। নিন্দার আয়ু দু-পাঁচ দিনের; টাকার গাঁথুনি পাকা। ভবিষ্যতে একদিন দেখবেন, এই ব্ল্যাক-মার্কেটারই দেশের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছে, কংগ্রেসের পাণ্ডা হয়েছে, মিনিস্টার হয়েছে। টাকাই জাত তৈরি করে, যোগ্যতা তৈরি করে! এ সত্যটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছি…'

কাশীপতি যে নিজেও ইহা বোঝেন না, তাহা নয়। কিন্তু টাকার অভাবে তিনি বংশকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

'এবার ডান দিকে', তিনি মোটর চালককে কহিলেন। তারপর সভয়ে মনে মনে বলিলেন, 'মেয়েটার উল আর আনা হলো না। হৈ-হাঙ্গামা বাধাবে…'

দম্ভ

শনিবারের দুপুরের নিদ্রাটা বিরজাসুন্দরী সর্ব্বদাই সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এদিন তিনটা সাড়ে তিনটার মধ্যেই কাশীপতি বাড়ি ফেরেন; তখনও ঘুম না ভাঙিলে ঠাট্টা শুনিতে হয়। তা ছাড়া, সজাগ এবং প্রস্তুত না থাকিলে কাশীপতি এটা-ওটা লইয়া হৈ-চৈ বাধাইয়া বসেন।

খাটের উপর নিশ্চুপ নিস্পন্দ পড়িয়া বিরজাসুন্দরী ঘুমের আমেজ দূর করিবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় বাহিরে জুতার আওয়াজ শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ঘুমের আধিক্যটা তিনি সর্ব্বদাই স্বামীর কাছ হইতে ঢাকিতে চেষ্টা করেন।

'জেগেছ নাকি, মা? একটু কথা আছে,' বলিয়া হরিপদ ঘরে ঢুকিল।

'আয়, ঘুম হয়ে গেছে।' বলিয়া বিরজাসুন্দরী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিলেন।

'এই নাও, এই একশো টাকা রেখে দাও। বাড়ি-খরচায় লাগিও না।' বলিয়া হরিপদ সগর্ব্বে দশ টাকার দশটি নোট মায়ের হাতে সমর্পণ করিল।

বিরজাসুন্দরী সপ্রশংস দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিলেন। প্রায় গর্ব্বিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আবার টাকা! এত টাকা দিয়ে আমি করব কি? আমাকে এত কেন! তুই নিজে খরচ কর।'

হরিপদ আজকাল আর কপর্দ্দকহীন বেকার নয়। সে আজকাল যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। একে শাড়ি দেয়, ওকে জামা দেয়, যখন তখন বাপ মায়ের হাতে নগদ টাকা আনিয়া দেয়। পরিবারে

তাহার মর্য্যাদা ও সম্মান প্রতিদিনই ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। জমি এবং বাড়ির দালালি যে রীতিমত লাভজনক ব্যবসা, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তাহাদের ধারণা ছিল না। কড়কড়ে টাকা উপার্জ্জন করিয়া হরিপদ দালালির মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিল।

হরিপদ কৃতীপুরুষের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাইয়াছে যে, অন্য মক্কেলের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক প্রমোদবাবুর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের দালালি করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার দু-পাঁচ বছর চলিয়া যাইবে। এমন মক্কেল হাজারে একটা মেলে না।

হরিপদ খাটের উপর ঝুঁকিয়া মায়ের প্রায় কানের কাছে মুখ লইয়া গেল এবং যেন কোথাও গোপন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান হইয়াছে, এমনি ভঙ্গিতে কহিল, 'একটা খুব ভালো খবর আছে!'

'কি খবর বাবা?' বিরজাসুন্দরী অপ্রত্যাশিত শুভসংবাদের জন্য আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

'একটু চেষ্টা-চরিত্তির করলে প্রমোদবাবুর সঙ্গেই বোধ করি উর্মির বিয়ে দেওয়া যায়!' হরিপদ উত্তেজনায় প্রায় হাঁপাইতে লাগিল। 'আভাসে ইঙ্গিতে মনে হচ্ছে, উর্মিকে তার পচ্ছন্দ হয়েছে…'

'বলিস কি রে!' বিরজা সবিস্ময়ে কহিলেন। 'তবে না বলিস, সে মস্ত বড় লোক। পাগল ছেলে, সে আমাদের ঘরে বিয়ে করতে চাইবে কোন দুঃখে!'

'কারণ আছে।' হরিপদ বোদ্ধার মত কহিল। 'না বুঝেই কি আমি বলছি। প্রমোদবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন গত বোশেখে। তারপর সেদিন তো আমাকে প্রায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সদ্-বংশের সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেলে গরিবের ঘরে বিয়ে করতে তার…'

'বয়স কত হবে?'

'তা ধর, চল্লিশ বেয়াল্লিশ। আমার চেয়ে সামান্য দু এক বছরের বড়ো…'

বিরজাসুন্দরী ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন, 'সুষির সঙ্গে হয় না?'

'তা যদি হবে,' হরিপদ সামান্য অধৈর্য্য হইয়া কহিল, 'তবে আর তোমাকে বল্লুম কি? উর্মিকে তাঁর পছন্দ হয়েছে মনে হচ্চে বলেই তো এতে উদ্যোগী হয়েছি। নইলে আমাদের এত বড়ো আস্পদ্দা! কাল রববার, কাল তাঁকে বিকেলে এখানে চা খেতে নেমন্তন্ন করে এসেছি। একটু ভালো করে…'

'চা!' বিরজাসুন্দরী সবিস্ময়ে কহিলেন। 'চা কেন! চা আবার লোককে খাওয়ায়! বললি তো এসে খেতে বললি নে কেন?'

'ঐ শোনো!' হরিপদ কহিল। 'চা মানেই কি মুড়ি চা! পিঠে-পায়েস যা পার ঘরে তৈরি করে রেখো, আমি কড়াপাকের সন্দেশ আর কেক্ কিনে নিয়ে আসব'খন। মোদ্দা, বেশ আদর-আপ্যায়ন করে' পাকে-প্রকাবে উর্মিকে ভালো করে' দেখিয়ে দিতে হবে।'

'মেয়ে দেখবে এতে আর দোষ কি!' বিরজাসুন্দরী শান্তকণ্ঠে কহিলেন। 'তবে কর্ত্তাকে আগে একবার বলে নিলে ভালো হতো—দিন-ক্ষণ দেখে শুভ-সময় স্থির করে…'

'তুমিও যেমন!' হরিপদ প্রায় কৃপাভরে কহিল। 'এ কি সেকেলে মেয়ে-দেখা? মেয়ে দেখার কথা আমিও বলিনি, সে-ও বলেনি। চায়ের নাম করে' ডেকে প্রকারান্তরে সে কাজটি সেরে দেওয়া আর কি! প্রমোদবাবুকে মেয়ে-দেখতে ডাকি এমন আস্পদ্দা কি আমাদের!'

রাতে শুইতে আসিয়া বিরজাসুন্দরী স্বামীকে সব কথা বলিলেন। একটু ভয়ে ভয়েই বলিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিয়া কাশীপতি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিলেন। মাত্র কয় ঘণ্টা আগে তিনি ঐশ্বর্য্যের সমারোহ দেখিয়া, সমৃদ্ধির আতিথ্য ভোগ করিয়া, উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছিলেন। এমন বড় ঘরে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া রীতিমত গর্ব্বিত বোধ করিলেন। মাত্র এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার পর ইহা তাঁহার কাছে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। কত সহজেই তিনি সতীশ লাহিড়ীর চেয়ে আরও বেশি মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তবে স্ত্রীর মতো স্বভাবতঃই তাঁরও মনে হইল, প্রস্তাবটা উর্মির সঙ্গে না হইয়া সুনির সঙ্গে হইলেই সঙ্গত হইত। কিন্তু পছন্দ লইয়া জোর করা চলে না, আজ অতি সহজেই তিনি এ কথাটা বুঝিলেন ও মানিয়া লইলেন।

'মেয়ে দেখতে আসবে, এতে আর আপত্তির কি।' তিনি বলিলেন। 'তবে আগে রাশি-চক্র মিলিয়ে দিন স্থির করলে ঠিক হতো।···তা যখন তাকে বলেই এসেছে, তখন তো আর চাড়া নেই। তোমাকে বল্‌তুমই, গিন্নী, এ হতেই হবে; মানী বংশের মর্য্যাদা কেউ না কেউ বুঝবেই। যার নিজের বংশ-মর্য্যাদা আছে সে-ই পরের···'

'আগে দেখ কি হয়, তবে তো!' বিরজাসুন্দরী সাবধানতা হিসাবে কহিলেন।

রবিবার ভোর হওয়া মাত্র সারা বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, ইহা রণ-সজ্জা নয়, গৃহ-সংস্কার ও গৃহসজ্জার আপ্রাণ উদ্যোগ। তারাপদর বিছানা অন্যত্র চালান হইল; তক্ত-

পোষের উপর ধবধবে শাদা চাদর বিছানো হইল; নক্সা-আঁকা টেবিল-ঢাক্‌না বার্ণিশহীন তেপায়ার কুশ্রীতা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। বিস্মৃত ফুলদানি অজ্ঞাত স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া সদ্যক্রীত ডালিয়া-ফুল বক্ষে ধারণ করিয়া কক্ষের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিল। বিরজা-সুন্দরী চন্দ্রপুলি, পাটি-সাপ্‌টা, ক্ষীরের সন্দেশ তৈরি করিলেন।

তারাপদ প্রথম হইতেই ব্যাপারটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। বড়লোকের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনের এই অতি-আগ্রহ তাহার প্রোলিটারিয়েট-সম্মানে বড়ো বেশি আঘাত করিল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বারবার বলিল, 'জমিদার! সমাজের পরগাছা! প্রজার রক্ত আর ভাড়াটের রক্ত শুষে যারা ছারপোকার জীবন যাপন করে, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে লজ্জা হওয়া উচিত!'

কিন্তু ব্যাপারটায় লজ্জিত হওয়া দূরের কথা, বাড়ির সকলকে রীতিমত গর্ব্বিত হইতে দেখিয়া তারাপদ ইহাদের পেতি-বুর্জ্জোয়া-সুলভ আচরণে হতাশ হইল, এবং তাহার শয়ন-ঘরের দখলিস্বত্ব পরিবারকে দান করিয়া যথাসময়ের বহু পূর্ব্বেই সে রবিবাসরীয় মিটিঙে যোগদানের জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

ঠিক চারটের সময় সদর-দরজার সমুখে প্রমোদ চৌধুরির প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি আসিয়া থামিল। এ গাড়িটা সেদিনকার গাড়ি নয়। তা ছাড়া আজ গাড়ি জবরজঙ্গ সাজের এক চালক চালাইয়া আনিয়াছে; গাড়ির সহিত ইহার আভিজাত্য সমান জাতের। একই গাড়ি এবং গাড়ির চালক দেখিলেই ইহাদের মালিকের উপর সম্ভ্রম জাগ্রত না হইয়া উপায় থাকে না।

হরিপদ ছুটিয়া গেল। কাশীপতিবাবুও তটস্থ হইয়া পিছনে পিছনে গেলেন। এত বড় সম্ভ্রান্ত অতিথি তাঁর বাড়িতে কখনও আসে নাই! কি করিয়া যথেষ্ট সমাদর দেখানো যায়, তিনি ভাবিয়া

পাইতেছেন না। অফিসের বড়ো সাহেবকে সমুখে দেখিলে যতটা ঝুঁকিয়া সেলাম করেন, ইঁহাকে কি ঠিক ততখানি ঝুঁকিয়া নমস্কার করিবেন, অথবা সম্ভাব্য সম্পর্কের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সাধারণ ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবেন!

কাশীপতি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই প্রমোদ গাড়ি হইতে নামিয়া আসিলেন, এবং হরিপদর কাছে পরিচয় পাইয়া দরজার মুখে ঝুঁকিয়া কাশীপতির দুই পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

'না না, এ কি! এ কেন!' কাশীপতি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। 'আসুন, ঘরে উঠে আসুন। গরিবের ঘরে এসেছেন, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য।'

'ছিঃ, আমাকে "আপনি" বলে বলবেন না।' প্রমোদ কহিলেন। 'আমি আপনার ছেলের বয়সী; আপনি করে' বললে লজ্জা পাই।··· বিলক্ষণ, আপনার বাড়ি আসব না! হরিপদ যে আমার বিশেষ বন্ধু-মানুষ! কত বড় নামী বংশ আপনাদের, সে কথা কি আমি শুনিনি মনে করেন! সময়ের অভাবে আমার আসা হয়ে ওঠেনি; কিন্তু আজ ভালো রকম পরিচয় করে' যাব···'

'তা করে' যাবে বৈ কি, বাবা, নিশ্চয়ই করে' যাবে।' প্রমোদের বিনয়ে সাহস পাইয়া কাশীপতি আত্মীয়তার পর্য্যায়ে নামিয়া আসিলেন। 'ভগবান্ যদি করেন···ও হরিপদ, প্রমোদবাবুকে ঘরে নিয়ে বসা। বড় সুখী হলাম, বড় আনন্দ হচ্ছে।···ওরে, সুষি, শুনছিস্···' বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে তিনি রন্ধনশালার দিকে ছুটিলেন।

মিষ্টান্নের প্রকাণ্ড থালাটা সুষমাই লইয়া গেল। তাহার পিছনে সলজ্জ মুখে উমা রূপার গেলাসে জল লইয়া উপস্থিত হইল।

প্রমোদ মহিলাদের সম্মানে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এত খাবার কার জন্য! আমরা সকলেই এক থালা থেকে খাচ্চি বুঝি? সে তো খুব মজার ব্যাপার!'

সহসা উমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পরক্ষণে মুখে আঁচল চাপা দিল।

সুষমা একবার তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে উমার দিকে তাকাইয়া প্রমোদকে কহিল, 'এ এমন কিছু বেশি নয়। এ সব আপনার জন্য মা নিজে তৈরি করেছেন, সব খেতে হবে।'

'আপনার মাকে আমার নমস্কার জানাবেন, কিন্তু একলা এত খাবার আমি দু'দিনেও শেষ করতে পারব না।' প্রমোদ সকৌতুক মুখে কহিলেন। 'কাজেই আপনার বোন হেসে উঠুন আর যাই করুন, আবার আমাকে প্রস্তাবটা করতেই হচ্চে। আসুন না, সবাই মিলে খাওয়া যাক। তবেই যদি এত সব শেষ করা যায়···আশা করি, আজকে আর আপনার মাথা ধরে নেই··'এটি উমার প্রতি।

উমা সকৌতুকে মনে মনে কহিল, 'তার জন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন!' কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার আভাসও দিল না। কহিল, 'একটু খাওয়ার জন্যে আপনাকে যদি এতটা সাধতে হয়, তবে মাথা ধরে যেতেও পারে, কি বলিস ভাই দিদি?' বলিয়া সে সহাস্যে সুষমার দিকে চাহিল।

সুষমা ভগ্নীর প্রগল্‌ভতায় অভ্যস্ত, তবু সামান্যপরিচিত অতিথির প্রতি এমন পরিহাস ক্ষেপণে সে সন্ত্রস্ত হইয়া ইঙ্গিতে উমাকে তিরস্কার করিল।

প্রমোদ সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এবার ঠকিয়েছেন। আচ্ছা, দেখা যাক, একা কতটা শেষ করতে পারি। কিন্তু আপনারা

এখানে থেকে এক-পা নড়লেই খাওয়া বন্ধ হবে, তা আগেই বলে রাখচি···'

'আমি এই চা-টা নিয়ে আসচি। তুই বস্, উমা। তুমি দেখো, মেজদা, উনি যেন খাওয়াতে ফাঁকি না দেন।' বলিয়া সুষমা তাড়াতাড়ি চা তৈরি করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

নানা প্রসঙ্গ উঠিল। নানা গল্প ও হাসি-পরিহাস চলিল। প্রমোদ খুব মিশুক মানুষ; আত্মীয়তা জমাইতে তার কষ্ট হয় না। ক্রমে উমার গানের কথা উঠিল। প্রমোদ শুনিবার জন্য জেদ করিলেন। উমা কিছুতেই রাজি হয় না; দু'জনের জেদের প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হইল। অবশেষে উমারই হার হইল। মনে মনে সে হারিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছিল, শুধু বেশ খানিকটা না সাধাইয়া লইয়া সে ইচ্ছাপূরণের পক্ষপাতী নয়। প্রমোদ গানের খুব তারিফ করিলেন।

'ওরে, বাবা! ন'টা!' সহসা ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রমোদ সাতঙ্কে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। 'এবার বাড়ি না ফিরলে এই বুড়ো বয়সে নির্ঘাৎ পিসিমার বকুনি শুনতে হবে! পিসিমা পিসিমাদের রীতি-অনুসারে এখনও আমাকে ছোট খোকাটি মনে করে' বসে আছেন; রাতে বাড়ি ফিরতে সামান্যমাত্র দেরি হলেই তীব্র শাসন করে থাকেন। আমার একমাত্র গার্জেন কিনা, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ!' বলিয়া প্রমোদ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল।

হরিপদ কৌতুকের সম্মানে দাঁত বাহিব করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, 'প্রমোদবাবুর যেমন কথা!'

'বিশ্বেস করছ না তো!' প্রমোদ সহাস্যে কহিলেন, 'অথচ ঠেলা সামলাতে হবে আমাকেই।···খুব আনন্দে আপনাদের এখানে

আজ ক'ঘণ্টা কাটিয়ে গেলুম। কিন্তু নেমন্তন্নের পাল্টা দিতে হয়, জানেন তো! শীগ্‌গিরই আপনাদের এর পাল্টা দিতে হবে।' প্রথমে সুষমা ও পরে উমার দিকে চাহিয়া প্রমোদ স্মিতমুখে কহিলেন।

দশ

অবস্থাটা জানিতে বাড়ির কাহারও আর বাকি রহিল না। প্রমোদবাবু উমাকে পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। হরিপদর কাছে তিনি নিজে হইতে বলিয়াছেন: 'তোমার ছোট বোনকে আমার বড় পছন্দ হয়েছে।' এই স্পষ্টোক্তির উপর বাড়ির কর্ত্তৃপক্ষ অনায়াসেই আশা বাঁধিতে পারিলেন।

সুষমা উমাকে প্রশ্ন করিল, 'তোর নিজের পছন্দ হয়েছে তো, উমি ?'

'মন্দ কি।' উমা প্রায় বিনা সঙ্কোচেই কহিয়াছে।

'ছোড়দার আপত্তি শুনেছিস্ তো ?'

'বড়লোকের নাম শুনলেই তো তার মাথা গরম হয়ে ওঠে।'

'তবে দোজ্‌বরে তোর আপত্তি নেই বল্ ?'

'আন্‌কোরা হলে আর কোন্ রাজপুত্তুর ঘুঁটে-কুড়োনীকে বিয়ে করতে চাইত! গুপ্তি-পাড়ার দত্ত বলে তো দুনিয়ার সবার শ্রদ্ধা গলে গলে পড়ছে!' বলিয়া উমা তার স্বভাবসিদ্ধ সকৌতুক হাস্য করিল। 'যাই বল ভাই দিদি, চিরকাল আমি গরিব হয়ে থাকতে পারব না। তার জন্যে যদি কিছুটা ছাড়তে হয়, তাতে রাজি আছি।...'

'তবে তো ভালই হলো!' সুষমা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল।

ইহার দিন পাঁচেক পরে প্রমোদবাবুর মোটরচালক প্রকাণ্ড মোটরে চড়িয়া সুষমার নামে এক চিঠি লইয়া আসিল। চিঠির লেখিকা জানাইয়াছে যে, প্রমোদবাবুর পিসিমা উমাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব

হইয়াছেন। তিনি অসুস্থ ও চলাচলে অক্ষম। কাজেই তিনি দুই বোনকে আলীপুরের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাইতেছেন। আগামী মঙ্গল বার যেন হরিপদবাবুসহ দুপুরে তারা খাইতে আসে।

পত্রলেখিকা প্রমোদবাবুকে 'দাদা' বলিয়া উল্লেখ করিলেও নিজেকে 'পরের বাড়ির মেয়ে' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, এবং পিসিমা পূজায় বসিয়াছেন বলিয়াই সে নিজে চিঠি লিখিতেছে এবং সুষমার মায়ের পরিবর্ত্তে সুষমাকে চিঠি লিখিতেছে, পরিশেষে ইহা উল্লেখ করিয়া ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিয়াছে।

কিন্তু বিরজাসুন্দরী ইহা এমন কোনও ত্রুটি মনে করিলেন না, বরঞ্চ ধনী পরিবারের বিনয়ে মুগ্ধ হইলেন। তবে বিয়ের আগে পাত্রের বাড়িতে পাত্রীর যাওয়া তাঁর মনঃপূত নয়। কাশীপতিবাবুও কিছুটা বিব্রত বোধ করিলেন। শুধু হরিপদই এ সব আপত্তি উড়াইয়া দিল। সে জানাইল, আধুনিক সমাজে ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। 'এখনও যদি তোমরা এমন সেকেলে হয়ে থাকবে,' সে বিরজাসুন্দরীকে প্রায় ধম্‌কাইয়া কহিল, 'তবে এমন জায়গায় মেয়ের সম্বন্ধ করবার শখ কেন! একটা মুদি বা মিস্ত্রী ধরে বিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়!'

বড় সমাজে এ রীতি চালু হইয়াছে, কাশীপতি স্বীকার করিলেন, এবং প্রমোদবাবুর অসুস্থ পিসীমার পক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ অনুমোদন করিবার পক্ষে পাত্রীকে একবার চাক্ষুষ দেখা প্রয়োজন, ইহার যৌক্তিকতা তাঁকে মানিতেই হইল। ধনীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে হইলে গরিবের চালে চলিলে হইবে কেন! ছোট ছেলে তারাপদ আপত্তি তুলিয়াছিল; কিন্তু ধনীদের প্রতি তার আক্রোশ সর্ব্বজনবিদিত। কাজেই তার আপত্তির কেহ বড় একটা মূল্য দিল না।

সুষমা মুখ টিপিয়া উমাকে কহিল, 'মেজদার সঙ্গে তুই একাই যা না। অকারণে আমাকে আবার টানা কেন।'

উমা কহিল, 'চল্‌ই, দিদি। একবার সরেজমিন তদন্ত করে' আসবি। রাজপ্রাসাদের দরজায় ক'টা হাতি বাঁধা আছে, দেখে নিতে হবে তো।'

'সে তুই দেখে নে গে।'

'তা হবে না, তুই না গেলে আমিও যাব না।'

জাজেস্‌ কোর্ট রোড হইতে মোড় লইয়া চক্‌চকে ডিল্যুক্স স্টুডিবেকার গাড়িটা এবার আলিপুর রোডে প্রবেশ করিল। রাস্তার উভয় দিকেই পাঁচিলঘেরা বাগানওয়ালা বড় বড় বাড়ি। প্রত্যেকটিই যেন এক একটা রাজবাড়ি! এ যেন মোটে কলিকাতা শহরই নয়, যেন এক নতুন রাজ্যের ঐশ্বর্য্যদীপ্ত অচেনা রাস্তা। যে নতুন জীবনে উমার প্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, এ রাস্তা যেন তাহারই প্রতীক।

সহসা একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িটা গতি-পরিবর্ত্তন করিল; একটা বন্ধ ফটকের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে পৌছিয়া অবলীলাক্রমে ব্রেক কষিয়া স্তব্ধ হইল। উমা ও সুষমা সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, লোহার ফটকের ওধারে প্রকাণ্ড এক তেতালা বাড়ি শীতকালীন রঙিন ফুলে-ভরা এক বাগানের মধ্যে যেন এক অতিকায় ফুলের মতো ফুটিয়া আছে। গাড়ির তুর্য্যধ্বনি শুনিয়া ফটক-সংলগ্ন ছোট একটা কুঠরি হইতে অবিলম্বেই এক নেপালী দারোয়ান দৌড়াইয়া আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল। আবার একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া মোটর গাড়ি বাগানের ভিতরকার রঙিন পথ ধরিয়া ছুটিল এবং দালানের এক পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ি-বারান্দায় পৌছিয়া তবে যেন নিশ্চিন্ত হইল।

সিঁড়ির মুখেই প্রমোদ দাঁড়াইয়াছিলেন। আগাইয়া আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া কহিলেন, 'আসুন। গরিবের বাড়িতে পদধূলি দিন।'

ইহাদের প্রথমে প্রমোদ সিঁড়ির নিকটবর্ত্তী বৈঠকখানায় বসাইলেন। সে তো ঘর নয়, যেন একটা ছোটখাট রাজত্ব! উমার মনে হইল, ইহার মধ্যে অনায়াসে তাহাদের বাড়ির মতো দুটো বাড়ি ভরিয়া রাখা চলে। ঘরের অর্দ্ধেক বিলিতি ফ্যাশানে কৌচ-সোফা-চেয়ারে সুসজ্জিত। ইহার অপর প্রান্তে প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড টেবিল; তাহার উপর বিজলী-বাতির বহু নীল ডোম্ অন্তরীক্ষচারী দর্শকের মতো আগ্রহভরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বৈঠকখানার এই দুই প্রান্তের প্রায় মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে নিচু বার্ণিস-করা পায়াওলা তক্তপোষের উপর ধব্ধবে শাদা ফরাস পাতা। ইহার একদিকে দামি কার্পেটের সুখাসন মখমলের তকেয়া ও রূপার গড়গড়ায় বেষ্টিত। দেওয়ালে নানা মুর‍্যাল চিত্র আঁকা, কোথাও বা গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় অয়েল পেণ্টিং। ঘরের এখানে ওখানে নানা ধরণের বেদীর উপর স-বস্ত্র ও বি-বস্ত্র বিবিধ মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

উমা একেবারে হাঁ হইয়া গেল। প্রমোদবাবু ধনী ও জমিদার, তাহা সে শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ যে এই ঐশ্বর্য্য ও এত আড়ম্বর, তাহা সে কল্পনাই করিতে পারে নাই। কাহারও মোটরে চড়িতে পারিলে তাহার যে বিহ্বল ভাবের সৃষ্টি হইত, তাহা যেন শত গুণ হইয়া ছুটিয়া আসিল। সুষমা চাপা মেয়ে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের এই অপরিমিততায় সে-ও যে স্তম্ভিত না হইয়া পারে নাই, একবার মাত্র দিদির চোখের দিকে চাহিয়াই উমা তাহা বুঝিতে পারিল।

'এক মিনিট!' অতিথিদের প্রতি প্রাথমিক অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন প্রদর্শন করিবার পর প্রমোদ কহিলেন, 'আমাদের আদত হোস্টেস্‌কেই ডেকে আনা হয় নি। মহিলাদের আদর-আপ্যায়নের আদব আমার জানা নেই, ওঁকে ডেকে আনাই নিরাপদ।' বলিয়া দুই বোনের দিকে সকৌতুক মুখে তাকাইয়া দরজার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং

দরজার বাহিরে দণ্ডায়মান বেয়ারাকে নিম্নস্বরে দু' একটা উপদেশ দিয়া দ্রুত দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিপদ সগর্ব্বে দুই বোনের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কি রকম দেখছিস, সুষি?'

'বড়লোকের বাড়ি, হবেই তো।' সুষমা শান্তকণ্ঠে কহিল।

'লোক কি রকম, দেখলি তো।' হরিপদ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কহিল। 'এত বড়লোক, অথচ একটুও দেমাক নেই। যেন আমাদের মতোই হেজিপেজি। এ জন্যই তো আমার এতখানি পছন্দ হয়েছে।'

মিনিট কয়েক পরেই বছর ছাব্বিশ-সাতাশের একটি সুশ্রী বিধবা মেয়ের কাঁধে আলগোছে গার্জ্জিয়ানি-ভঙ্গিতে হাত রাখিয়া প্রমোদ ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন, 'ইনি মন্টিরাণী। আমাদের বাড়ির একচ্ছত্র কর্ত্রী।'

'প্রমোদদার একটা কথাও বিশ্বাস করো না, ভাই।' বলিয়া মন্টি দুই বোন যে সোফায় বসিয়াছিল সেদিকে সহাস্যে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'আমি বিনে পয়সার ম্যানেজার, এ কথাটা বললে পাছে আমার মনে লাগে, রাগ করে' কাজ ছেড়ে চলে যাই, তাই ভদ্রলোকদের সামনে উনি আমাকে বড় বড় উপাধি দিয়ে থাকেন। তোমাদের কোনটি উমা, কোনটি সুষমা?'

দোহারা গড়ন, ফর্সা সুশ্রী মেয়েটি। মুখ হাসিভরা, চলন-বলনে চটুলতা, চোখে দুষ্টুমির আভাস। সূক্ষ্ম কালো পেড়ে ধুতি পরণে, গায়ে সাদা অর্গাণ্ডির ব্লাউজ। পায়ে কিছু নাই। হাতে এক গাছা করিয়া চুড়ি। যার প্রিয়া, গৃহিণী এবং মা হওয়া উচিত ছিল, সে যেন হঠাৎ পথ-ভুল করিয়া বৈধব্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

'এদের যা আদর-আপ্যায়ন করবার, তার সব দায়িত্ব তোমার উপর, মণ্টিঠাকৃরুণ।' প্রমোদ সকৌতুকে কহিলেন। 'নিন্দে হলে তোমারই হবে। এর পর আমার আর কোনও দায় রইল না··· পিসিমার পূজো কদ্দূর? প্রথমে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আনো···'

'পিসিমার পূজো!' মণ্টি পরিহাসের কণ্ঠে কহিল। 'সাঙ্গ না হলেও কথা-বার্ত্তা চালাতে কষ্ট হয় না। তোমার নিজের কাজ মিটে থাকে তো বল; যা করবার সবই আমি করব, ভয় নেই। হ্যাঁ, ভাই, কত জোরে চেঁচাতে পার?' বলিয়া মণ্টি উমার দিকে চাহিল।

উমা প্রশ্নের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া নীরবেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

'হাসছ!' মণ্টি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিল, 'এ মোটেই হাসির ব্যাপার নয়, কান্নার ব্যাপার। চিৎকার কবে করে গলা ফেটে রক্ত বেরুবে, তবু পিসিমা শুনতে পাবেন না। তবে, হ্যাঁ, এটা অনেকের কাছে সুবিধাজনকও বটে।'

'হ্যাঁ, তা নিশ্চয়।' প্রমোদ জোরে হাসিয়া উঠিলেন। 'এতে আর সন্দেহ কি। যেমন চাকর-বাকরদের সুবিধের কথাটাই ধরা যাক্। পিসিমার পেছন থেকে একটা আস্ত আলমারি সরিয়ে নিয়ে গেলেও পিসিমা টের পাবেন না। এটা কি জনসাধারণের কম বড় সুবিধে!' বলিয়া প্রমোদ আবার উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

'তা বৈ কি। চল ভাই, তোমাদের সব দেখাই।' বলিয়া মণ্টি দুই বোনের হাত আকর্ষণ করিল।

চলিতে চলিতেই মণ্টি এই পরিবারের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তার সম্পর্কটি জানাইল। প্রমোদের পিসিমা তরঙ্গিণীর সে দেওর-ঝি। দু'বছর পূর্ব্বে স্বামীবিয়োগ হইলে সে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসে।

তারপর বাপও গত বৎসর মারা গেছেন। সংসারে অনটন শুরু হয়। ভাইয়ের উপার্জ্জন সামান্য; তাদের নিজেদের সংসার চলা কঠিন। বৌদির সঙ্গে ঝগডাঝাটি ক্রমেই তিক্ত আকার ধারণ করিল। তখন জ্যাঠাইমা তরঙ্গিণী একদিন মণ্টিকে এখানে লইয়া আসিলেন। সেই হইতেই সে এখানে বাস করিতেছে, অনাথা আশ্রয় পাইয়াছে।

কিন্তু অনাথার কোনও লক্ষণই আর এখন মণ্টির মধ্যে নাই। সে হুকুম করিয়া কথা বলে, যথেচ্ছ হাসি-পরিহাস করে, সব কিছুকেই নিজের আয়ত্তাধীন মনে করে। কোনও জডতা নাই। এ বাড়ির উপর যেন তার জন্মগত অধিকার।

অনর্গল কথা কহিতে কহিতে সে সুষমা ও উমাকে বাড়ির বিভিন্ন ঘর দেখাইতে লাগিল। নানা কিছু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইল, এ বাড়ির নানা ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিল। বিরাট খানা-কাম্‌রা, প্রকাণ্ড লাইব্রেরি, স্মোকিং রুম, রিটায়ারিং রুম, অফিস-ঘর প্রভৃতি দেখাইয়া সে দুই বোনের তাক্‌ লাগাইয়া দিল। বাগানটা ঘুরাইয়া দেখাইবার প্রস্তাব করিয়া সে নিজেই উহা বৈকালের জন্য মুলতুবি রাখিল।

'চল, দোতলাটাই আগে দেখিয়ে আনি', এইবার মণ্টি কহিল, 'পিসিমার পূজোর ঘরও দোতলায়ই। ঐ সঙ্গে তাঁকেও তোমাদের একবার দেখিয়ে আনতে হবে। তিনিই বাড়ির কর্ত্রী, শুধু কানে শুনতে না পাওয়ায় সব কিছুর উপর নজর রাখতে পারেন না।' বলিয়া সে দুষ্টুমিপূর্ণ চাহনিতে উমার দিকে চাহিল।

দুই বো'নের কাছে ঐশ্বর্য্যের যেন একটা অভাবনীয় ও বিরাট প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। কত আসবাব, কত কার্পেট, কত ঝাড়-লণ্ঠন, কত মূর্ত্তি, কত বিচিত্র খেলনা, কত দামি পর্দ্দা, লাল নীল মাছের কাঁচের আধার, কত বিভিন্ন ধরণের কক্ষ ও কক্ষ-সজ্জা। উমার

মাথা ঘুরিয়া গেল। এ সমস্তই তার হইবে! এ বাড়ির কর্ত্রী হইবে সে! এমন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে! তাহার হুকুমে এত বড় প্রাসাদের এত অসংখ্য দাসদাসী ছুটোছুটি করিবে! উমার কাছে ইহা প্রায় অসম্ভব মনে হইল। মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

'এস ভাই, ভেতরে এস। জ্যাঠাইমাকে দেখিয়ে নিই।' অবশেষে একটা ভেজানো দরজার কাছে আসিয়া মন্টি কহিল।

'পুজোর ঘর?' সুষমা জিজ্ঞাসা করিল।

'হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা জুতো খোল, আমি পিসিমার আগে ধ্যান ভাঙাই গিয়ে।' বলিয়া মন্টি দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

'কেমন দেখছিস, দিদি? পছন্দ হচ্ছে?' এইবার প্রথম সুযোগ পাইয়া উমা দিদির কানেব কাছে মুখ লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল।

'তোর পছন্দ হলেই হলো।' সুষমা বোনের দিকে একটা তৃপ্ত সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিল।

'এস ভাই, ভেতরে এস।' দরজার মুখের কাছে মন্টি পুনরাবির্ভূতা হইয়া কহিল।

পূজার বিচিত্র উপকরণের সম্মুখে একজন স্থূলকায়া বৃদ্ধা কার্পেটের আসনে আসীন। সমুখের শিবমূর্ত্তিটি পুষ্প-বর্ষণে ইতিমধ্যেই চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, অথচ তামার কোশায় এখনও যে পরিমাণ ফুল মজুদ আছে, তাহাতে আরও দশটি শিব চাপা দেওয়া চলে। পূজা সমাপ্ত হইতে এখনও যে বিলক্ষণ বিলম্ব আছে, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বৃদ্ধা ভাবলেশহীন মুখে দুই ভগ্নীর দিকে তাকাইলেন।

মন্টি কহিল, 'এরা দু'জন প্রমোদদার বন্ধুর বোন।'

'হ্যাঁ, আর একটু দেরি আছে।' পূজাপরায়ণা তরঙ্গিণী জবাব দিলেন।

মণ্টি চকিতে একবার দুই বোনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া আরও চেঁচাইয়া কহিল, 'তা বলছি না! এরা প্রমোদদার বন্ধুর বোন।'

তরঙ্গিণী ঘাড নাড়িলেন। কহিলেন, 'পাশের বাড়ি থেকে বেড়াতে এসেছে? এমন অবেলায় কেন? নিয়ে বসা গে।'

'কি মুস্কিল!' মণ্টি কৌতুকের ভঙ্গিতে কহিল। 'এদের আজ এখানে খাবার নেমন্তন্ন, তোমাকে বলিনি?'

'নেমন্তন্ন!' তরঙ্গিণী কথাটা আশ্চর্য্য সহজে শুনিতে পাইলেন। 'সে আজ কেন? পুরুত-ঠাকুর বললেন না, সে বেস্পতিবার। আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তোরা···'

মণ্টি আর চেঁচাইল না। হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল, ব্যাপারটা তাহা নয়। সুষমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'তবেই বুঝতে পারছ, একে নিয়ে চলা কি মুস্কিল। চল, এবার আমরা বাইরে পালাই।'

সুষমা একটু আহত বোধ করিল। তরঙ্গিণীর আগ্রহেই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, মণ্টির চিঠি পড়িয়া তাহাদের এই ধারণাই হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তরঙ্গিণীর আগ্রহের কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করা গেল না। কে জানে, হয়তো ইহাই বড়লোকের খেয়াল! লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভুলিয়া যায় বা অতিথির প্রতি যথোচিত খাতির দেখায় না। কিন্তু ইহা লইয়া অভিমান করিবার অর্থ হয় না। বধিরত্বের যে পর্য্যায়ে তরঙ্গিণী পৌছিয়াছেন, তাহাতে সারা জগৎটাই তাঁহার কাছে মিথ্যা ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবার কথা। তা ছাড়া, প্রকৃত পক্ষে বাড়ির কর্ত্তা প্রমোদবাবুই যে তাহাদের পাণ্টা-নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহাই তো ব্যাপার। প্রমোদবাবু ও মণ্টিরাণী তাহাদের প্রতি

যথোচিতের চেয়েও বেশি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেছে। ইহার পরও কি ক্ষোভ থাকিতে পারে!

'জেনি কোথায়? জেনিকে একবার ডেকে দে দিকিনি, মন্টি।'

মন্টি সদলবলে কক্ষ-ত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'জেনি মাছ কুটতে গেছে।' মন্টি চেঁচাইয়া কহিল। 'কেন, কি দরকার?'

'মাছ কুটতে কেন! এই না পূজোর কাজ করবার জন্য চান করে এল?' তরঙ্গিণী সবিরক্তিতে কহিলেন।

'পূজোর কাজ হয়ে যায় নি? আবার কি চাই?'

'কি মুস্কিল!' বৃদ্ধা গজর গজর করিতে করিতে কহিলেন। 'চন্দনে কম পড়েছে, এখন বেটে দেয় কে! তুই কি চান্ করেছিস? তবে না হয় তুই-ই…'

'চানের আর সময় পেলুম কোথায়!' মন্টি সপ্রতিবাদে জানাইল। 'আজ ঐ দিয়েই চালিয়ে নাও, জ্যাঠাইমা। কাল বরঞ্চ বেশি করে…'

'আচ্ছা ভাই, আমিই বেটে দিই না।' সুষমা আগাইয়া আসিয়া কহিল। 'আমরা তো চান করেই এসেছি।…'

'এ বেটে দিলে চলবে?' সুষমাকে দেখাইয়া মন্টি উচ্চৈঃস্বরে তরঙ্গিণীকে কহিল। 'বাড়ি থেকে চান্ ক'রে এসেছে।…'

বৃদ্ধা এক সেকেণ্ডকাল সুষমার মুখের দিকে তাকাইয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

এই অবকাশে মন্টি উমাকে একলা পাইল। বলিল, 'চল ভাই, তোমাকে তেতলাটা দেখিয়ে আনি। ওটাই হলো প্রমোদদার খাস্-এলাকা।'

'চল।' উমা কহিল।

তেতলার সিঁড়ির মুখে পাজামা ও ওয়েইস্ট-কোট-পরা শীর্ণ চেহারার একটা প্রৌঢ় বেয়ারা বসিয়াছিল, ইহাদের উপরে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং অপরিচিতা অতিথিকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

'একে চিনে রাখ্, তাজি।' উমার দিকে একবার দুষ্টুমিপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া মণ্টি বেয়ারাকে কহিল।

তাজি মুখ দিয়া একটা দুর্ব্বোধ্য ধ্বনি উদ্গার করিয়া আবার সেলাম করিল।

'লোকটা বোবা।' মণ্টি কহিল।

'তোমাদের বাড়ি দেখছি কেউ বা কানে শুনতে পায় না, কেউ বা কথা বলতে পারে না,' উমা সকৌতুকে কহিল। কিন্তু বাড়ির কর্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করা সমীচীন হয় নাই ভাবিয়া সে ভীত হইয়া উঠিল।

'এতে কত লোকের কত সুবিধে হয়!' মণ্টি রগড়ের সুরেই কহিল।

উমা আশ্বস্ত হইল। তরঙ্গিণীর প্রতি কটাক্ষটা তবে মণ্টি গায়ে মাখে নাই। মণ্টি উমাকে তেতলার ঘরগুলি দেখাইতে লাগিল। বিভিন্ন আসবাব ও বিশেষ বিশেষ সজ্জা-সম্ভারের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবশেষে দক্ষিণ-প্রান্তের একটি মনোরম শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া মণ্টি কহিল, 'এ-কাম্‌রাটা ভালো ক'রে চিনে রাখো, ভাই। এটা প্রমোদদার শোবার ঘর।'

'যাও!' উমা সলজ্জভাবে কহিল।

মণ্টি ক্ষণকাল উমার সলজ্জ মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিল, 'প্রমোদদা তোমাদের ওখানে কতদিন ধ'রে যাতায়াত করছেন, ভাই? অনেক দিন কি?'

'না তো !' উমা কহিল। 'এই তো সেদিন মাত্র আমাদের সঙ্গে চেনা হ'ল...'

'তোমাকে কিছু বলেছেন ?'

'যাঃ !' উমা কহিল। 'তা-ও বলে !'

'কেমন লাগচে বাড়িটা ?'

'ভাল।'

'আর মানুষটিকে ?'

'যাঃ !'

'আচ্ছা, আজ থাক। ক'দিন পরে নিজে থেকেই এসে বলবে। অভিজ্ঞতা না হ'লে বলে' বোঝানো যায় না, জানি।' বলিয়া মণ্টি সজোরে হাসিয়া উঠিল।

এগারো

ইহার মাস দেড়েক পরে কাশীপতি একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া হাউ-মাউ করিয়া উঠিলেন। অবসরগ্রহণের বয়স লইয়া কোম্পানী ও য়ুনিয়নের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, আজ তাহার একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেছে। ইহার ফলে, ষাট বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক কর্ম্মচারিদের আগামী আর্থিক বৎসরের শুরুতেই অবসর দেওয়া হইবে। কাশীপতি নিজেকে ষাটের কয়েক মাস কম প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সে-চেষ্টা কতখানি ফলবতী হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। আর কোম্পানী তাহার আর্জ্জি মানিয়া লইলেই বা কি? ইহাতে বড় জোর ছ' মাসের মেয়াদ বাড়িবে বৈ তো নয়। তারপর তো বেকার হইতে হইবে। সরকারী চাকরি নয় যে, অবসর গ্রহণের পর মাসে-মাসে নিয়মিত পেন্সন পাওয়া যাইবে। তাহার অবসর হওয়া অর্থ উপবাসের সূত্রপাত। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডে কয়েক হাজার টাকা জমিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা খরচ করিয়া ফেলিলে মেয়েদের বিয়ে দিবেন কি দিয়া! তা' ছাড়া, এই সামান্য মূলধন ব্যয় করিয়া খাওয়াই বা কতকাল চলিবে? কাশীপতি জগৎ অন্ধকার দেখিলেন।

আয়ের একটা পথ বাহির করিবার জন্য কাশীপতি যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। গুপ্তিপাড়ার দত্ত বংশের পক্ষে অসম্মানজনক কোনও কাজ করা চলিবে না, অথচ সামান্য মূলধনে কোন্ সম্ভ্রান্ত ব্যবসা শুরু করা চলে! এক ইন্স্যুরেন্সের দালালি; এই বয়সে লোকের দরজায় খোসামোদ করিয়া বেড়াইতে পারিবেন কি? জমির দালালি করিয়া হরিপদ আজকাল ভালো আয় করিতেছে। কিন্তু সম্পত্তির মালিক

কাহাকেই বা কাশীপতি জানেন, এ ব্যবসায়ে তার অভিজ্ঞতাই বা কি? বাড়িতে গোটা কয়েক গরু রাখিয়া দুধের ব্যবসা করিতে পারেন, কিন্তু পাড়ার লোকের কাছে দুধ বেচিলে গুপ্তিপাড়ার দত্তদের বংশমর্য্যাদা কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? কাশীপতি রাতে শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন না, দিনে হা-হুতাশ করেন। তাঁহার চিন্‌চিনে মেজাজ বিগড়াইয়া এখন তিরিক্ষি হইয়া উঠিয়াছে।

তারাপদ একদিন কহিল, 'অত ভাবনার কি আছে! আমরা যা হোক দু-চার পয়সা কামাচ্ছি তো। তা' ছাড়া মেজদাও তো আজকাল কিছু কিছু…'

'তা তো করছেন।' কাশীপতি প্রবুদ্ধ না হইয়া কহিলেন। 'কিন্তু পরিবারের এই সামান্য আয় থেকে প্রতি মাসে দু'শোটি করে টাকা কমে গেলে খাওয়া-পরা চলবে কি? এ-দিকে চালের দর চারগুণ বাঁধা হয়েছে, তাতেও ফি-হপ্তা ব্ল্যাক-মার্কেটে কিনতে হয়; আট আনা সেরের মাছ তিন টাকা হয়েও থামছে না, দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। ছ'আনার চিনি চৌদ্দ আনায়ও পাওয়া যাচ্ছে না। সর্ষের তেল…'

'ক্যাপিটেলিস্টদের তাতে সুবিধেই হচ্চে।' তারাপদ দাঁতে দাঁতে স্বগত কহিল, এবং প্রকাশ্যে বলিল, 'যদি দু'চার হাজার টাকা খাটাতে পারেন, তবে আমি একটা ব্যবসায় লাগিয়ে দিতে পারি…'

'আরে টাকাই তো হ'ল আদত সমস্যে।' কাশীপতি ঈষৎ আহত হইয়া কহিলেন। 'নইলে ব্যবসা কি আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারিনে? কত টাকা বল্লে, দু'তিন হাজার? তা বলো, তুমি কি বলছ তাই শুনি?'

তারাপদ কহিল, 'আমাদের প্রকাশ পাড়াতেই একটা মোটর মেরামতের কারখানা খুলেছে, দেখেছেন তো? এরই মধ্যে তা থেকে

দু'শো আড়াই-শো টাকা প্রতি মাসে আয় হচ্চে। যদি আর কিছু যন্ত্রপাতি কিনে কারখানাটা একটু বাড়ানো যায়, তবে চাই কি, মাসে দু'পাঁচশো করে আয় হতে পারে। আপনি কিছু টাকা ফেলতে পারেন তো প্রকাশ আপনাকে পার্টনার হিসেবে···'

'পার্টনার !' কাশীপতি বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন।

'এতে ওরও সুবিধে।' তারাপদ কহিল। 'ও তো নিজে দুপুর বেলায় দোকানে থাকতে পারে না; খদ্দের এসে ফিরে যায়। এ সময়টায় আপনি দেখাশোনা করলে আরও কিছু বিজ্‌নেস্ আসে। তা ছাড়া···'

'তা বৈকি !' এইবার কাশীপতির বিস্ময় ভ্রূকুটি করিয়া ভেংচাইয়া উঠিল। 'সব হলো, এবার আমার মিস্ত্রী না সাজ্‌লে চলবে কেন ! এখন আমার নিজের ছেলে এসে পরামর্শ দিচ্চেন, যাও, এবার বস্তির মিস্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যবসার অংশীদার হও গিয়ে। মরে যাই ! এ-কথা মুখে আনতে লজ্জা হলো না? টাকা কামাতে হবে বলে কি লজ্জা-সরম মান-মর্য্যাদা সব বিসর্জ্জন দিতে হবে ! আমি গুপ্তিপাড়ার দত্ত, না খেয়ে মরব, তবু বংশের মর্য্যাদা ছোট করব না।'

তারাপদ মনে মনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, 'হায়, পেতি-বুর্জ্জোয়া, সব গেছে তবু দাম্ভিকতা ছাড়তে পারছ না !' কিন্তু প্রকাশ্যে তাহা উল্লেখ না করিয়া বিরক্তভাবে কহিল, 'বেশ, যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। আমার যা মনে হলো, তাই বল্লুম, নইলে প্রকাশ মোটেই পার্টনার নেবে কিনা, তাও জোর করে' বলতে পারিনে।'

'যথেষ্ট হয়েচে !' কাশীপতিও রুষ্টকণ্ঠে কহিলেন। 'তোমাদের কারুর পরামর্শই আমার দরকার নেই। আমার পথ আমি

নিজেই দেখে নেব। তা বলে, বুড়ো বয়সে সব মান-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে মিস্তিরিগিরি শুরু করতে পারব না, হঁ্যা !'

তারাপদ বাপের আদরের ছেলে। তাহার সহিত কাশীপতির এই তর্কাতর্কির কথা শুনিয়া হরিপদ নিজ হইতে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'বেশ তো বাবা, আপনি বড় রাস্তার মোড়ে একটা স্টেশনারি দোকান খুলুন। আমার জানা পার্টির একটা ভালো ঘর খালি...'

'তা তো খুল্লুম,' কাশীপতি বিরসকণ্ঠে কহিলেন, 'কিন্তু টাকাটা আসছে কোত্থেকে ? দু-তিন হাজার টাকার স্টেশনারি দোকান থেকে ক' পয়সা আয় হবে শুনি ? অথচ একটু বড় করে' দোকান করতে গেলেই...'

'তার জন্য ভাববেন না।' হরিপদ মাতব্বরের মতো কহিল। 'ইতিমধ্যেই প্রমোদবাবুকে কয়েক হাজার টাকার জন্য আমি বলে রেখেছি। আমার পাওনা থেকে ক্রমে ক্রমে এ টাকা কেটে রাখলে আর কারুরই কোনও অসুবিধে নেই...'

কাশীপতির মেজাজ নরম হইল। হরিপদর দিকে একবার চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'কি বল্লেন, রাজি হলেন ?'

'আজ বিকেলে তার ওখানে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন আছে।' হরিপদ কহিল। 'তখুনি কথাটা পাকা করে' নেব ভাবছি। না দিয়ে যাবে কোথায় ? আমার হাত দিয়ে তার অনেক লাখ টাকার লেন-দেন হচ্চে।...'

কাশীপতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, 'বিয়ের দিন-টিন সম্বন্ধে কিছু কথা হলো ?'

'দু' দশ দিনের মধ্যে,' হরিপদ আশ্বাস দিয়া কহিল, 'তারও একটা পাকাপাকি করে' ফেলতে পারব বলে বোধ হচ্ছে। হাইকোর্টের

মামলাটার ঝামেলায়ই সব পিছিয়ে যাচ্ছে, নইলে এই ফাল্গুন মাসেই লাগিয়ে দিতে পারতাম।'

ইহার দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা কাশীপতিবাবু সস্ত্রীক কালীঘাটের মন্দিরে গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই উমা হরিপদর সাথে সিনেমা দেখিতে গিয়াছে। হরিপদ সুষমাকেও ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে যায় নাই। একেই তো সে নিত্যিনিত্যি সিনেমায় গিয়া পয়সা ফেলার পক্ষপাতী নয়; প্রায়ই সে সিনেমা যাওয়ার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। তার উপর আজ তো তার রীতিমত কাজ আছে। আজ সকাল হইতেই বিরজাসুন্দরী কালীদর্শনে যাইবেন বলিয়া রাখিয়াছেন। মাসে দু'একদিনের বেশি তিনি বাড়ির বাহির হন না। সুতরাং সুষমার আজ কিছুতেই কোথাও যাওয়া চলে না। সে গেলে মার যাওয়া বন্ধ হয়।

কড়াতে সম্ভার ভাজিয়া গামলা হইতে সবেমাত্র তাহাতে ডাল ছাড়িয়া রান্নাঘরময় সে একটা সোরগোলের সৃষ্টি করিয়াছে, এমন সময় সদর-দরজার কাছ হইতে ডাক আসিল, 'তারাপদ আছ? তারাপদ…'

কোমরে জড়ানো আঁচলটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া সুষমা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। কহিল, 'কই, দাদা তো এখনও বাড়ি আসেন নি।'

'এখনও আসেনি?' প্রকাশ অপ্রতিভভাবে কহিল। 'আমাকে বল্লে, এই আধঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি, সন্ধ্যাবেলা এসো।'

'আপনি বসুন। হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

'মেজদা আছেন?'

'না। কেউ বাড়ি নেই।' সুষমা কহিল। 'উমাকে নিয়ে মেজদা সিনেমা দেখতে গেছেন।'

প্রকাশ একটু দ্বিধা করিল। তারপর কহিল, 'ওরা বুঝি খুবই সিনেমা দেখেন। গত হপ্তায় রূপবাণীতে গিয়েছিলাম, ওঁদের দেখলাম। উপরতলায় বেশি-দামি সীটগুলির দিকে চলেছেন। সঙ্গে কে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। বছর চল্লিশ আন্দাজের, বেশ ফর্শা, সম্ভ্রান্ত দেখতে। এদের সাথে একদিন থিয়েটারেও এঁকে দেখেছিলাম, একেবারে প্রথম রো-তে বসে আছেন।' আর অগ্রসর হইবে কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া প্রকাশ থামিল।

সুষমা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, 'কারুকে বলবেন না, এঁরই সঙ্গে উমার বিয়ে হচ্ছে। হাতিবাগানের চৌধুরি জমিদারবাবুদের ছোট তরফের কর্ত্তা।'

'ওঃ, তাই!' প্রকাশ যেন আশ্বস্ত হইয়া কহিল। 'আমি ঠিক জানতুম না, কিন্তু পাড়ার শম্ভু এদের কথা নিয়ে ফক্কুড়ি করতে এসেছিল বলে দুটো থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়েছি। পাড়ার ছেলেগুলি হয়েছে এমন বদ্‌মাস!'

'এতে নিন্দের কি আছে?'

'কিছু না।' প্রকাশ সজোরে স্বীকার করিল।

সুষমা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যেই তাহাদের বাড়িতে বড়ো বড়ো মোটরগাড়ির আনাগোনা এবং তাহাতে চড়িয়া উমা ও হরিপদর সর্ব্বদাই বাহিরে যাওয়ার নানা সমালোচনা শুরু করিয়াছে, তাহার কিছু কিছু খবর সুষমা আগেই পাইয়াছে। কিন্তু ইহার কদর্য্যতা যে এতখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে, চড় মারিয়া প্রকাশকে একজনের মুখ বন্ধ করিতে হইবে, ইহা সুষমা ভাবে নাই।

সত্যই বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে। মন্টিরাণীর নিমন্ত্রণ লাগিয়াই আছে। নিমন্ত্রিতদের লইয়া যাইবার জন্য তাদের বাড়ির জীর্ণ সদর-

দরজার সামনে সর্ব্বদাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া হাজির হয়। সেই প্রথম বারের পর মাত্র আর একবার সুষমা ও-বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। উমার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আর সে যায় নাই; নানা কাজের অজুহাতে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছে। রগড় করিয়া কহিয়াছে, 'ওদের খুশি রাখার গরজ তোর। আমি কেন তার হাঙ্গামা পোহাব।' কাজেই হরিপদসহ উমাকেই যাইতে হইয়াছে। বেচারি উমা! ধনীর সঙ্গে বিয়ে না হইলে তার চলিবেই না!

'আমার একটা কথা ছিল। যদি অনুমতি করেন···'

'কি?' সবিস্ময়ে সুষমা প্রকাশের দিকে চাহিল।

'দেখুন, মানে আপনি আমার কারখানাটার কথা শুনেছেন কি?···' প্রকাশ কাশিয়া গলার জড়তা সাফ্ করিল।

'হ্যাঁ, শুনেছি।' সুষমা কহিল।

'ওটা থেকে,' প্রকাশ দ্রুতস্বরে কহিল, 'গত দু'মাস হয় গড়পড়তা তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা আয় হচ্ছে।'

'ওঃ!' এই সংবাদের উপস্থিত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সুষমা কহিল।

'ইচ্ছে করলে,' প্রকাশ অসমান কণ্ঠে কহিল, 'এমন আমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারি। ছেড়ে দিলে আয় হয়তো আরও বাড়বে মনে হচ্ছে, একটা ভদ্রজীবন যাপনের মতো আমার সামর্থ্য হয়েছে। আপনি হয় তো জানেন না, ভদ্র হবার জন্য, সমাজের আর একটু উঁচু তলায় ওঠবার জন্য আমার কি দুরন্ত আগ্রহ।···এসব বলা হয় তো আমার উচিত হচ্ছে না, কিন্তু আমার সব আশা-ভরসা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনার দয়ার উপর নির্ভর করচে!'

'আমার!' সুষমা শিহরিয়া উঠিল। 'তার মানে?'

'জানি, এ আমার বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ!' প্রকাশ গভীর স্বরে কহিল। 'কিন্তু আর তো না বলে পারিনে। আমি বস্তির বাসিন্দা বলে আপনি কি আমাকে ঘৃণা করবেন? আমার বংশমর্য্যাদা নেই বলে কি আমাকে ছোট ভাববেন? আমি আপনাকে···আপনাকে বিয়ে করতে চাই···'

'দেখুন, এ কথা আমাকে না বলে বোধহয় আমার বাবাকে বলাই উচিত হবে।' সুষমা গম্ভীর অচঞ্চল কণ্ঠে কহিল।

'আমি ভাবলাম, তার আগে একবার···বেশ, আমি তাই করব, তাই করব।' সহসা প্রকাশ যেন সুষমার কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া হৃষ্ট হইয়া উঠিল। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এতেই আমার যথেষ্ট হলো। এবার আর আমার কোনও ভয় নেই।' বলিয়া একটা ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো প্রায় শূন্য দিয়া উড়িয়া প্রকাশ বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

তারাপদ বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সুষমা বারান্দার থাম ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

'চুপ করে' এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?'

'ওঃ! ছোড়দা! রান্না বসিয়ে একটু হাওয়াতে এলুম।'

'একটু চা করে দে তো। পারবি? বরঞ্চ উমিকেই বল না।' তারাপদ সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কহিল।

'ওরা কেউই বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'উমি মেজদার সঙ্গে সিনেমায় গেছে। বাবা-মা···'

'সিনেমা! নেমন্তন্ন। হল্লা! মোটর!' তারাপদ তিক্তস্বরে কহিল। 'এরা কি আরম্ভ করেছে, শুনি? বড়লোকের টাকার সম্মানে সবাই গলে গেছে! কর্ত্তার গোঁড়ামি পর্য্যন্ত উদারতায়

পৌঁছে গেছে। এদিকে পাড়ার লোকের টিট্‌কিরিতে যে কান পাতা যাচ্ছে না। এ সব কি হচ্চে শুনি? সব পেতি-বুর্জ্জোয়ার হাড়ে ক্যাপিটেলিস্টশ্রেণীভুক্ত হওয়ার শখ। এই দুর্ব্বলতা পুঁজিবাদী তাদের উদ্দেশ্যসাধনে কাজে লাগায়। প্রোলিটারিয়েট-মনোবৃত্তি গঠনের পক্ষে এটাই হলো সব চেয়ে…'

'তুমি জামা-কাপড় ছাড়। আমি চা আর খাবার নিয়ে আসছি।' তারাপদর বক্তৃতার মধ্যপথেই সুষমা তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দিল।

'বাড়িতে যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড চলছে!' বক্তৃতায় বাধা পাইয়া তারাপদর কণ্ঠস্বর উষ্ণ হইয়া উঠিল। মেঝেটাকে প্রায় লাথি মারিতে মারিতে সে নিজ ঘরে পৌঁছাইল।

বারো

খুব ভোরেই বিরজাসুন্দরী শয্যাত্যাগ করিয়া দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হন। আজও অন্ধকার থাকিতে উঠিয়াছেন। বধূ-অবস্থা হইতেই এই অভ্যাসে তিনি অভ্যস্ত। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, লক্ষ্মীর আসন হইতে বাসি ফুল ও পিঁপড়ার আক্রমণ-জর্জ্জর বাতাসাসহ পুজার রেকাবি ও বাসনগুলি তুলিয়া লইয়া তিনি আগামী আট নয় ঘণ্টার জন্য শয়ন-ঘর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

'আজ একটু মাংস খেলে কেমন হয়, গিন্নী ?'

বিরজা খাটের দিকে চোখ ফিরাইলেন। সেখানে কাশীপতি একটা পাড়ের ওয়াড়-পরানো কাঁথা গায়ে দিয়া এখনও অর্দ্ধঘুমন্তের মতো পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, খাওয়ার বাসনা জানাইবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হইল না এবং পাছে এমন একটা সঙ্গত দাবিতে বিরজাসুন্দরী কোনও রূপ আপত্তি তোলেন, যেন সে জন্যই কহিলেন, 'বহু দিন মাংস আসে নি। মাস দু'এক তো হবেই। আর আসবেই বা কোত্থেকে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।··· আজ অফিস-ফেরতা কিনে আনব'খন···'

'আজ থাক।' বিরজাসুন্দরী সংক্ষেপে কহিলেন।

'থাকবে! থাকবে কেন? তুমি ভেবো না, আমি হিসেব করে রেখেছি, হাতের টাকায়ই কুলিয়ে নেব'খন। ছেলেপিলেগুলি বহু দিন···'

'মন্টিরাণী উমি আর হরিকে আজ রেতে খেতে বলেছে।' বিরজা কহিলেন।

'ওঃ, তবে আজ থাক। ওদেরই জন্য আনা। ওরাই যদি···' কাশীপতি দ্রুত লোভ সংবরণ করিয়া নীরব হইলেন।

'এ কিন্তু আমার কাছে ভাল লাগছে না।' বিরজাসুন্দরী অননুমোদনের কণ্ঠে কহিলেন। 'এমন নিত্যিনিত্যি নেমন্তন্ন কেন? তাও বুঝতাম, বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে! অত বড় আইবুড়ো মেয়ে নিত্যিনিত্যি অনাত্মীয় অবান্ধবের বাড়ি যাতায়াত করলে পরেরই বা কি বলে, আর নিজেরই বা কোন্ ভরসা।···তুমি হরিকে ডেকে একদিন বারণ করে' দিলেই পার। এমন আদিখ্যেতা··'

'আরে দূর! তোমাদের যত আজগুবি ভয়।' কাশীপতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিলেন। 'ও-বাড়ির মণ্টিরাণীর সঙ্গে উর্মির খুব ভাব হয়েছে, দেখছ না। উর্মি আমাদের কম মিশুক মেয়ে! আর ভয়েরই বা এতে কি আছে? হরিপদ তো সঙ্গেই থাকে, একা তো আর যায় না। এ নিয়ে মিছিমিছি একটা মন কষাকষি করা কি উচিত হবে? ব্যাপার কি জানো, গিন্নী, উর্মিকে বড় ঘরে দিতে পারলে তবেই এ-পরিবারের একমাত্র বাঁচোয়া। তবেই আবার গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারি। তবেই দশজনকে বলতে পারি, গুপ্তিপাড়ার দত্তদের কদর বোঝবার লোক আছে।···'

বিরজাসুন্দরী তবু আপত্তি করিয়া কহিলেন, 'তা যেন হলো, কিন্তু সব কিছুই মানিয়ে করতে হয়। বিয়ে-না-হওয়া মেয়ের কি এমন করে যখন তখন পরের বাড়ি যাওয়া চলে। তবেই পাঁচটা কথা ওঠে। এরই মধ্যেই তো কেউ-কেউ ফিস্‌ফাস্ করছে, দু'পাঁচ কথা কানে···'

'এটা মহা ছোটলোকের পাড়া।' কাশীপতি পলকে সারাটা পাড়ার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন। 'আমার বাড়িতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে, আমার মেয়েরা সেজেগুজে বেড়াতে যাচ্ছে, এ কি কম অপরাধ! তা বেশ তো, হরিপদকে ডেকে তুমিই

বলে দিও একটু যেন মানিয়ে চলে। তা বলে, পাড়ার পাঁচটা বাঁদর ছেলে, পাঁচটা হিংসুটে গিন্নী নিন্দে রটাচ্ছে বলে আমি সব দিক থেকেই একটা সুযোগ্য সম্বন্ধ ভেঙে দেব, সে কোনও কাজের কথা নয়…'

'তা তারাই বা বিয়ের কথা পাকা করছে না কেন?' বিরজাসুন্দরী অস্পষ্টভাবে কহিলেন।

'পাত্রপক্ষের ওপর কি জোর চলে, গিন্নী?' কাশীপতি ও-পক্ষের হইয়া কহিলেন। 'তবে, হ্যাঁ, এবার তাদের কথা পাকা করতেই হবে। বোশেখেই দিন-স্থির হবে, হরিপদ সে-দিন এসে বল্‌লে না। হাইকোর্টে তাদের মামলা চলছে। সেই হাঙ্গামা নিয়েই তারা অস্থির, বিয়ের কথা ভাবে কে?…'

'যাই, উনুনে আঁচ দিই গিয়ে।' বলিয়া বিরজাসুন্দরী সেইখানেই প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন।

'আর দেখো', কাশীপতি ডাকিয়া কহিলেন, 'হরিপদকে বলে দিও, সেই টাকার কথাটা যেন আজ পাকা করে' আসতে চেষ্টা করে। এ তো ধার নেওয়া বৈ নয়, এ চাইতে আর লজ্জা কি। অথচ মূলধন না পেলে ব্যবসা শুরু করি, এমন সাধ্যি আমার নেই। নেমন্তন্নে যাবার আগে হরিপদকে ডেকে বেশ ভালো করে' বলে দিও। ওর তো কোনও কিছুরই খেয়াল থাকে না, গল্পে জমে গেল তো গেলই…তবে আজ আর মাংস আনব না, কি বল?'

দিনের কাজকর্ম্ম গতানুগতিকভাবে অগ্রসর হয়। কাশীপতি সাড়ে ন'টায় নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া অফিসে ছোটেন। ইহার পর ক' ঘণ্টার যে ফাঁক আছে, তাহাতে গৃহস্থালির নানান্ কাজ আঁটাইতে হয়। হরিপদ বারোটায় খাইতে বসে। কোনও দিন সুষমা ও উমা এই

সময়ই খাইয়া লয়, কোনও দিন বা ইহার পরে বসে। তারপর বেলা একটা দেড়টায় তারাপদ খাইতে আসে।

আজও সে যথাসময়ে খাইতে আসিয়াছে। বিরজাসুন্দরী ছেলেকে খাওয়ার আনিয়া দিতেছেন। সুষমা কাছে বসিয়া আছে; উমা রমাদের বাড়ি গিয়াছে। তারাপদ বা বাড়ির অন্য কেউ বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলে এই দ্বিপ্রাহরিক বেড়ানো বন্ধ হয়, তারপর আবার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলে।

'কোথায় গো বউ, খেতে বসেছ নাকি? ও মা, এখনও বসে বসে ছেলে খাওয়াচ্ছ!' বলিতে বলিতে বিরজাসুন্দরীর চেয়ে বছর দশেকের বড়ো স্থূলকায়া এক বিধবা রান্নাঘরের দরজার কাছে হাজির হইলেন।

'এসো, ঠাকুরঝি।' বিরজা তারাপদর পাতে ডাল পরিবেশন স্থগিত রাখিয়া কহিলেন। 'এইবারই নাইতে যাব। যা সুষি, ঠাকুর-ঝিকে ঘরে নিয়ে বসাগে।'

'আমাকে আবার ঘরে বসাতে হবে কেন লা, বৌ।' ঠাকুরঝি কহিলেন। 'ওপরতলায় থাকি বলে কি এমনি পর হয়ে গেলুম। না হয় এক দঙ্গল ছেলেপিলে সাম্‌লে দুদণ্ড এসে বসবার সময় পাইনে। আজ একটু ফুরসৎ পেলুম, দুটো সুখ-দুখের কথা কয়ে যাই! মোড়াটা এগিয়ে দে দিকি সুষি, দরজার কাছেই বসি। ছেলেপিলের দৌরাত্ম্যিতে হাড় জ্বালাতন! অথচ মা-মরা ভাইপো-ভাইঝিদের হেলা-ফেলা হবে, তা তো দু' চক্ষে দেখতে পারব না। যার এতগুলি ছেলেপিলে তার নাকি আবার বিয়ে না করলে চলে! কিন্তু তুমি বললেই আর সে কথা শুনছে কে।...আজ কি রেঁধেছিস বৌ? মাছ নেই বুঝি?...' বলিয়া তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে তারাপদর পাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মনমোহিনী উপরতলার বাসিন্দা। তাহার বিপত্নীক ভাইয়ের গৃহে সেই একচ্ছত্র গৃহিণী। অল্পবয়স্ক ভাইপো ও ভাইঝিদের বকিয়া, তাড়না করিয়া, তত্ত্বাবধান করিয়া মনমোহিনী উহাদের ঐহিক এবং পারমার্থিক কোনও উন্নতিরই ত্রুটি রাখেন না। সারাক্ষণ তার কাজ এবং বকা-ঝকা চলিতেছে। নিচতলায় বিরজাসুন্দরীর কাছে এক-মাত্র কাজের চাপেই আসিতে পারেন না, এ কথাটা তিনি সর্ব্বদাই জানাইয়া দেন; তবে যখন আসেন, তখন ঘণ্টা পাঁচেকের আগে ওঠেন না। উমা তাহার নাম দিয়াছে, "ডাইনী"। তবে বাড়ির লোকের ভয় ডাইনীর তুক্‌তাকের জন্য নয়; তাহার অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সচল জিহ্বাটিই আতঙ্কের কারণ। বিরজাসুন্দরী বুঝিলেন, তাঁহার দুপুরের ঘুম আজ চুলায় গিয়াছে; তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন না।

মোড়ায় বসিতে বসিতে মনমোহিনী কহিলেন, 'দাদাকে তুই-ই চারটি ভাত দিতে পারিস নে, সুষি? এত বড় মেয়ে থাকতেও মাকে যদি না-চান না-খাওয়া ভাত দেওয়ার জন্য বসে থাকতে হয়, তবে আর…'

'ও তো দিতে চায়ই, ঠাকুরঝি। ও-ই তো রোজ দেয়।' বিরজা-সুন্দরী কন্যার স্বপক্ষে কহিলেন! 'আজ ছোট-খোকা এসে পড়েছে দেখে আমিই বল্লুম…'

'তুমি তো বলবেই, বৌ। অবোলা পশুর মতো মুখ বুঁজে খেটেই যাচ্ছ, এ কি আর নিত্যি নিজ চোখেই দেখছি নে।' মনমোহিনী প্রতিবাদ না মানিয়া সহানুভূতিতে অটল রহিলেন। 'তা বলে মা-বাপের প্রতি ছেলেমেয়েদের কি কোনও কর্ত্তব্য নেই!…তোরা দু' বোন আছিস্, পালা করে' তোরা যদি…উমি কোথায়? তাকে দেখছিনে! পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?…'

'রমার মা একটু আগে ঝি পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে গেছেন।' সুষমা মিথ্যা করিয়া কহিল।

'বেড়ানো, বেড়ানো, আর বেড়ানো! মেয়ের তো ঐ এক কাজ!' সুষমার কৈফিয়ৎ মনমোহিনীকে স্পর্শও করিল না। 'তোমাকেও বলি বউ, সোমত্ত মেয়েকে কেউ এমনও আস্কারা দেয়! এ বয়সে শেকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতে হয়। তবে, হ্যাঁ, যখন মাস্টারণীর চাকরি নিয়েছে, তখন না বেরিয়ে উপায় নেই জানি, কিন্তু তা বলে...'

'চাকরি!' বিরজাসুন্দরী সবিস্ময়ে কহিলেন, 'কে চাকরি নিয়েছে?'

'ও মা, সে কি কথা!' মনমোহিনী সফল গোয়েন্দার তৃপ্তির সঙ্গে কহিলেন, 'এ কথা ঢাকতে চাস্ কার কাছে, বৌ! আমাদের কি দুটো চোখ আছে, না নেই? এই যে রোজ দোরে বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায়, সেজেগুঁজে মেয়ে বের হয়ে যায়, এ কি দেখিনি মনে করিস? তা ভাবলুম, মন্দ কি! বড়মানুষের বাড়িই মনে হচ্ছে। গান শিখিয়ে মেয়েটা যদি সংসারে দু-পাঁচ টাকা আনতে পারে, সে এমন কোনও নিন্দের কথা নয়। কত মেয়ে তো আজকাল বাবুদের মতো অফিসে পর্য্যন্ত গিয়ে চাকরি করছে।—তবে কি জানো, অফিস আর বাড়িতে তফাৎ আছে। ভাল করে' সব না জেনে শুনে মেয়েদের কারুর বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। কার মনে কি আছে, কে বলবে! কতদিন ধরেই তোমাকে কথাটা বলব বলব ভাবছি, বৌ, শত হোক তোমরা তো নিজের লোকেরই মতো। সময় থাকতে সাবধান না করলে অকর্ত্তব্য হবে।—আমাদের এক জানা লোকের এক মেয়ের কি সর্ব্বনাশটা হলো, তা তো প্রায় নিজ চোখেই দেখেছি। এক লক্ষপতির বাড়িতে মেয়ে-পড়াবার কাজ নিয়ে শেষে সেই হতভাগী কুল খুইয়ে... ছেলেপিলের সামনে সে কথা কি বলব, বুঝতেই পাচ্ছ, সে কি সর্ব্বনাশ! তাই ভাবলুম, মেয়েকে চাকরিতে দিয়েছ, অভাবের

সংসারে দুটো পয়সা আসছে, তা এমন কিছু মন্দ কাজ নয়, তবে বিপদের দিকে দিষ্টি রেখে না চললে আখেরে কত বড় সর্ব্বনাশ হতে পারে তাই জানিয়ে রাখলুম, নইলে আমার আর কি।'

সুষমা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হরিপদ তাহার এক বন্ধুর কাছ হইতে মোটর চাহিয়া আনিয়া উমা এবং পরিবারের অন্যান্য-দের বেড়াইতে লইয়া যায়, আগে হইতে তৈরি করা এই ব্যাখ্যাটা শুনাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সভয়ে সুষমা রসনা সংযত করিল। এমন মামুলি ব্যাখ্যা মনমোহিনীর হাতে কি নিদারুণ নিগ্রহ লাভ করিবে, তাহা কল্পনা করিয়াও সে শিহরিয়া উঠিল।

'আর চারটি খা, বাবা! কিছুই যে খেলিনে।' বিরজাসুন্দরী উঠিবার জন্য ব্যস্ত তারাপদকে কহিলেন।

'টাইম হয়ে গেছে। আর দেরি করা চলবে না।' বলিয়া তারাপদ উঠিয়া আঁচাইতে গেল।

'ব্যাটাছেলেদের তো ঐ দোষ!' মনমোহিনী মন্তব্য করিলেন। 'হাজার পদ না রাঁধলে তাদের মন ওঠে না। আমিও তেমন, কত খাবে খাও। আমাকে ঠকাবার জো নেই। বলবে কম পদ রেঁধেছি তার উপায় রাখি নে—চল্‌রে সুষি, এবার ও-ঘরে গিয়েই বসি। এসেচি যখন একটু বসেই যাই। বালিগঞ্জের বাড়িটা মেরামত হয়ে গেলে তোদের ছেড়ে যেতে হবে, ভেবে কত কষ্ট পাই…'

হরিপদর সচ্ছল অবস্থা আজকাল তার জামা-কাপড়ে পরিস্ফুট। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে চক্‌চকে কালো লপেটা ও ফরাসডাঙ্গা ধুতি পরিয়া সে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। সুষমা-উমার মিলিত শয়ন-ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে চাহিয়া অধৈর্য্যভাবে কহিল, 'আর

কতক্ষণ দেরি করবি, উমি। আয়, এবার চলে আয়। আধ ঘণ্টার ওপর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

ইহার পর আরও দশ মিনিট অধৈর্য্যের নানা স্বরে আহ্বানের পর উমার ঘরের কপাট খুলিল। দামি জর্জ্জেট শাড়ি ও সাটিনের ব্লাউজ পরিয়া অতি মনোরম বেশে সলজ্জ ভাবে উমা বাহির হইয়া আসিল। এ সমস্ত সাজই হরিপদ তাহাকে অতি সম্প্রতি কিনিয়া দিয়াছে। হরিপদর আয় কিরূপ বাড়িয়াছে, ইহা তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন।

হরিপদ কহিল, 'তোদের নিয়ে বেরুতে হলেই যত হাঙ্গামা। চল্, চল্, আর দেরি নয়। প্রমোদবাবুর সঙ্গে আজ আমার জরুরি বিজ্‌নেস্ টক্ আছে। খাওয়ার আগেই সেরে ফেলতে হবে!'

'চলো না, আমি তো তৈরি।' উমা তার স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে কহিল। 'এখনও তো ভালো করে' সন্ধ্যেই হয় নি, তার ঢের সময় পাবে···'

বিরজাসুন্দরী রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া কহিলেন, 'ফিরতে যেন দেরি করিস নি, উমি। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবি···'

উমা মার দিকে চাহিয়া কহিল, 'মা যেন কি! পরের বাড়িতে যেন আমি বলতে যাব, দাও, আমাকে এক্ষুনি খেতে দাও। সে আমি পারব না।···যাচ্ছি, যাচ্ছি মেজদা', বলিয়া সদর-দরজার মুখে দাঁড়াইয়া-পড়া হরিপদর অধৈর্য্য আহ্বানে সাড়া দিয়া সে দ্রুত আগাইয়া গেল।

ঠিক এই সময় তারপদ বাড়ি ফিরিয়াছে। সদর-দরজার মুখেই সে ফুলবাবুর বেশে হরিপদকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। ইতিপূর্ব্বেই সে নিশ্চল মোটরটা লক্ষ্য করিয়াছে। এইবার আগাইয়া-আসা উমাকে তার অতি কাছাকাছি আবিষ্কার করিল।

'কোথা যাচ্ছিস?' সহসা তারাপদ উমার দিকে ফিরিয়া বিরস ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

উমা কথার সুরে হক্‌চকাইয়া গেল ; তাহার গলায় কোন জবাবই জোগাইল না। হরিপদ কহিল, 'আর দেরি করিস নি, উমি। চলে আয়।'

'খপরদার!' তারাপদ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। 'কোথাও যেতে পারবি নি…'

'কেন, যেতে পারবে না কেন শুনি?' হরিপদ আগাইয়া আসিল।

'নির্ল্লজ্জ হওয়ার একটা মাত্রা আছে।' তারাপদ উমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল। 'পরের বাড়িতে নিজেকে এমন করে' দেখাতে যেতে লজ্জা করে না, লক্ষীছাড়ী? বড়লোকের নাম শুনে বাড়িশুদ্ধ লোক পাগল হয়ে উঠেছে! লজ্জা-সরম চুলোয় গেছে। কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান লোপ পেয়েছে। ধিঙ্গি মেয়ের ধিঙ্গিপনা করতে একটু লজ্জা হচ্ছে না! যা, ভেতরে যা…'

'তুমি যেতে নিষেধ করতে কে শুনি?' হরিপদ তাহার নব-লব্ধ মর্য্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত করিয়া প্রতিবাদ করিল। 'আমি ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, দেখছ না? ও গার্জ্জেনের সঙ্গে যাচ্ছে, গার্জ্জেনের সঙ্গেই ফিরবে…'

'রেখে দিন গার্জ্জেন!' তারাপদ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল। 'ঘটে যার এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই, তিনি ফলাচ্ছেন গার্জ্জেনগিরি! দালালির ক'টা টাকা হাতে পেয়ে নিজেকে ভারি বিচক্ষণ ঠাউরেছেন! বড়লোকের উচ্ছিষ্ট খেয়ে তার পা চেটে দেমাক করা হচ্ছে!…কোথাও যাওয়া হবে না, বলে দিলুম, উমি। এই মুহূর্ত্তে ঘরে যা। নইলে তোরই একদিন আর আমারই একদিন।' বলিয়া তারাপদ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিল।

'ভাল হবে না, তারাপদ। এ সব জবরদস্তি চলবে না।…শুনছো, মা, পার তো তোমার ছোটছেলেকে সামলাও, নইলে আজ আমি

খুনোখুনি করে' ছাড়ব!' হরিপদও সহুঙ্কারে কহিল, এবং উমার দিকে চাহিয়া অভয় দিয়া কহিল, 'চলে আয়, উমি···'

বিরজাসুন্দরী ছুটিয়া আসিলেন। সুষমা ছুটিয়া আসিল। উপরতলার জানালা দিয়া মনমোহিনী উঁকি দিলেন। উমা কিছু বলিল না, কোনও দিকে চাহিল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিয়া নিজের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া দরজার খিল বন্ধ করিল।

হরিপদ তর্জ্জন করিয়া কহিল, 'কেউ না যাক্, আমি একাই যাব। কথা দিয়ে কথার...'

'স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।' তারাপদ সব্যঙ্গে কহিল। 'কিন্তু ভবিষ্যতে এদের কাউকে যেন সে বাড়িতে নেবার চেষ্টা করবেন না। এটা বাড়ির সব্বারই শুনে রাখা দরকার। তোমাকেও, মা, আগে থাকতে একথা জানিয়ে রাখছি। এর অন্যথা হলে একদিন যদি ভয়ঙ্কর কিছু করে' বসি, তখন কিছুটি বলতে পারবে না।··· ক্যাপিটেলিস্টদের নির্লজ্জ এক্স্প্লয়টেশন নিজের বাড়িতে সহ্য করব, আমি তেমন পাত্র নই!···'

'বড় গায়ের জোর দেখাচ্ছেন! গুরুজনকে যে শ্রদ্ধা দেখায় না, সে আবার মানুষ!' বলিয়া তারাপদকে আর অধিক না ঘাঁটাইয়া হরিপদ সদর-দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মোটরে গিয়া চড়িল।

তেরো

কাশীপতিবাবু যদিও বুঝিলেন তাঁহার অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ইহাতে বিপন্ন হইল, তবুও তিনি তারাপদকেই সমর্থন করিলেন। শত হোক, গুপ্তিপাড়ার দত্তদের একটা বংশ-মর্য্যাদা আছে! বড় মানুষের বাড়িতে মেয়ে দিবার জন্য উপযাচক হইয়া নিজেদের ছোট করা চলে না। উহাদের গরজ থাকিলে উহারাই কথা পাকা করিবে।

হরিপদ কিন্তু ঘোষণা করিল যে, এইরূপ গোঁয়ার্তুমি করিয়া মেয়েটার সর্ব্বনাশ করা হইল। তারা হেজিপেজি লোক নয় যে, যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিবে। কিন্তু সে-ও আর উমাকে চৌধুরি-বাড়ির নিমন্ত্রণে লইয়া যাইবার সাহস করিল না। তারাপদ গোঁয়ার মানুষ, কি অনর্থ বাধাইয়া বসে ঠিক কি! পর পর কয়দিন প্রমোদবাবুর মোটর আসিয়া শূন্য ফিরিয়া গেল। না-যাইবার বিস্তৃত অজুহাত দেওয়া হইল, কিন্তু সেগুলি সবই বড় ঠুন্‌কো। মাত্র অল্প ক'দিন আগে এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর কারণেও গাড়ি খালি ফিরিত না। কিন্তু হরিপদ দমিবার পাত্র নয়। সে কহিল, 'কুছ্ পরোয়া নেই। আমিই তোকে নানান্ জায়গায় বেরিয়ে আনব, সিনেমা দেখাব, রেষ্টুরেন্টে খাওয়াব, গাঁটের পয়সা খরচা করেই তোর সব শখ মিটিয়ে দেব। দেখি কার কত মুরোদ, আমাকে বাধা দেয়। রেগে গেলে আমি বাপকেও তোয়াক্কা করিনে...'

কেহই ইহাতে বাধা দিল না। হরিপদ তার কাঁচা পয়সায় উমাকে বিস্তর সিনেমা-থিয়েটার দেখাইতে লাগিল, নানা শাড়ি-কাপড় কিনিয়া দিল, ট্রামে-বাসে তাকে শহরের নানা দ্রষ্টব্য দেখাইয়া আনিল। দু'

একদিন সুষমাও যায়, কিন্তু হৈ-হৈ তার ভালো লাগে না। অধিকাংশ দিনই সে বাড়ি থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করে।

কাশীপতি স্ত্রীর কাছে বিরক্তিসহকারে বলেন, 'অপব্যয়!' তারাপদ মার কাছে তিক্তস্বরে মন্তব্য করে, 'মেয়েটার পরকাল একেবারে ঝরঝরে হচ্চে!' উমার বলে, 'ভাগ্যিস্ মেজদার টাকা হয়েচে, নইলে কোনও জম্মে এত সব দেখতুম না।' সুষমা বলে, 'মেজদাকে আস্কারা দিলে আর কথা আছে! যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দেবে।' কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিতে লাগিল। টাকা হরিপদর স্বোপার্জ্জিত। ইচ্ছামত টাকা অপব্যয় করিয়াও আজকাল বাপকে সে নিয়মিত সাহায্য করিতেছে। সুতরাং উমার শখ মিটিবার অসুবিধা হইল না।

সেদিন বিকেলের দিকে হরিপদ উমাকে লইয়া ট্রাম-রাস্তার দিকে চলিয়াছে। জোর পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে সে কহিল, 'দেরি হয়ে গেল না রে? ক'টা বেজেছে বল দিকি? একটা হাত-ঘড়ি না কিনলে আর কিছুতেই চলছে না…'

'ঢের সময় আছে।' হরিপদর সঙ্গে তাল রাখিতে চেষ্টা করিতে করিতে উমা কহিল। 'ছ'টা বাজতে এখনও পনেরো-কুড়ি মিনিট। অত জোরে ছুটছ কেন!…'

'ভদ্রলোক আবার দাঁড়িয়ে না থাকেন। তার তো সাড়ে পাঁচটায়…'

'একটু দাঁড়িয়ে থাকলেনই বা।'

'দেখ তো একবার কাণ্ড,' হরিপদ আক্রোশ এবং আক্ষেপের মাঝামাঝি একটা সুরে কহিল, 'কোথায় মোটর চড়ে', শিঙ্গে বাজিয়ে হুস্ করে গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছব, না তো ঝরঝরে ট্রামে

চাপতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি! তা বেশ, ট্রাম ট্রামই সই, কিন্তু তা বলে তারপদর গোঁয়ার্ত্তুমিতে এমন একটা ভাল সম্বন্ধ ভেস্তে যাবে, সে-ও কখনও হতে দিতে পারি। মেজাজ দেখালেই চলে না, অনেক ভেবে-চিন্তে তবে কাজ করতে হয়।...দেখছিস্ তো প্রমোদবাবুকে, এমন প্রকাণ্ড ধনী লোক, অথচ একটুও তার দেমাক নেই একেবারে দিল্-দরিয়া মানুষ। এমন লোক বাড়ির জামাই হলে কারুর কোনও দুঃখুই থাকবে না। কিন্তু তারাপদ কি অত শত ভেবে দেখে। মজুরদের কাছে গরম গরম বক্তিমে দিয়ে সে তো পৃথিবীকেই সারাক্ষণ উল্টে দিচ্ছে। কিন্তু তাকে ভয় পাবার লোক এ-শর্ম্মা নয়! যেমন ইচ্ছে, তেমন চলব। কিন্তু ভেবে দেখলুম, কাজ কি ঝামেলায়। এই তো ভালো। সাপও মরছে, অথচ লাঠিও...'

ট্রাম-স্টপে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ট্রাম পাওয়া গেল না। হরিপদ অধৈর্য্য হইয়া হাঁসফাস্ করিতে লাগিল; ট্রামের সহিত অশাস্ত্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিল, বারবার কহিল, 'টাইম্ দিয়ে টাইম্ না রাখতে পারা কম লজ্জার কথা!' এবং ট্যাক্সি ডাকিবার প্রস্তাব করিল। এবার কিন্তু উমাই সঞ্চয়ী হইয়া তাহার বে-হিসেবী দাদাকে নিরস্ত করিল। কহিল, 'চলো না, তার চেয়ে হেঁটেই যাই, বাপু। হাজ্রার মোড়ে পৌঁছতে আর ক'মিনিটই বা লাগবে!...'

'তা বৈ কি!' হরিপদ বিরক্ত হইয়া কহিল, 'আর ভদ্রলোক আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকুন। একেই তো তার সঙ্গে আমাদের বাড়ির দুর্ব্ব্যবহারের অন্ত নেই, তার ওপর আর এ সইবে না...'

এমন সময় পলাতক ট্রাম আসিয়া হাজির হইয়া হরিপদর সমস্যার সমাধান করিয়া দিল। সিনেমার দীপালোকিত প্রবেশ-চত্বরে যখন তাহারা পৌঁছাইল, তখনও ছ'টা বাজিতে পাঁচ-সাত মিনিট বাকি আছে।

'এই যে হরিপদ! এই যে উমা দেবী! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রাখ্‌লে বলো দেখি।'

উভয়েই পাশে তাকাইয়া সহাস্যমুখ প্রমোদবাবুকে আবিষ্কার করিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যই একটু দেরি হয়ে গেছে।' হরিপদ বিব্রত হইয়া কহিল। 'আমি পই পই করে' বল্লুম, একটা ট্যাক্সি নেই। তা ও কিছুতেই...'

'তার মানে, উমা দেবী এখনও তোমার মতো বড়মানুষ হ'তে পারেনি!' প্রমোদ সকৌতুকে কহিলেন। 'দু'পা আসতেই দেখি তোমাকে ট্যাক্সি চাপ্‌তে হয়। ঢের টাকা কামাচ্ছ দেখছি!...কিন্তু উমা দেবীকে প্রথমেই হতাশ করতে হচ্ছে...'

'এখনও টিকিট কেনেন নি বুঝি? এদিকে হাউস্‌-ফুল টাঙানো দেখছি।' উমা অনুযোগের সুরে কহিল।

'টিকিট আমার পকেটে।' প্রমোদ কহিলেন। 'কিন্তু তা হলে কি হবে, দেখা ভাগ্যে নেই।'

'রাতের টিকিট কিনেছেন বুঝি?' উমা হতাশ হইয়া কহিল। 'রাতের শো-তে আমার দেখা চলবে না। আমি মাকে কথা দিয়ে এসেছি, নটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে যাব...'

প্রমোদ ক্ষণকাল সহাস্য সকৌতুক মুখে উমার হতাশা-ভরা মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর হরিপদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তুমিই বল হরিপদবাবু, কপালে লেখা না থাকলে কিছু কি হবার উপায় আছে, তা টিকেট কেনাই থাক, আর নাই থাক। উমা দেবীর আজ সিনেমা দেখার বরাত নেই, এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন। তবে, হ্যাঁ, সন্ধ্যেটা নেহাৎ মাঠে মারা যাবে না।...আমি নিজে কিছু জানিনে, এদিকে আমার বাগানবাড়িতে মস্ত জল্‌সার ব্যবস্থা

ঠিক। আমাকে বল্লে কাল রাত্তিরে। দেখতো একবার কাণ্ড! এদিকে আমি পূর্ব্বব্যবস্থামত সিনেমার টিকেট কাটিয়ে রেখেছি। কিন্তু জল্‌সা খান্‌দানি ব্যাপার, তাকে ওল্‌টাবার সাধ্যি নেই। জলসাকেই শিরোধার্য্য করে নিতে হলো। তোমাদের একটা খবর পাঠাবো, তার তো আর উপায় নেই। ভাবলুম, মন্দ কি, ধ্রুপদ-খেয়াল এমন কিছু ভয়ঙ্কর জিনিষ নয় যে, উমা দেবীর পিলে চম্‌কে অনর্থ ঘটাবে।'

'জলসায় গেলে দেরি হয়ে যাবে।' উমা ইতস্তত করিয়া কহিল।

'ক্ষেপেছ, তোমাকে বকুনি খাওয়াব, এমন পাষণ্ড কখনও হতে পারি!' প্রমোদ রগড়ের সুরেই কহিলেন, 'অন্তত তুমি যাতে রাত নটার ভেতরই বাড়ি ফিরতে পার, তার পুরো দায়িত্ব নিচ্ছি, ভেবো না।'

'মণ্টিদি আসছেন?'

'আসতে বাধা কি?'

'আমরা বরঞ্চ আজ বাড়িই ফিরি, কি বল, দাদা?'

'বেশ, চল। আমিও জল্‌সায় গর-হাজির হই।' প্রমোদ অভিমানের সুরে কহিলেন। 'নিন্দে হোক আমার, লোকে বলুক বেল্লিকের নেমন্তন্ন। মণ্টি খোঁটা দিক, বলুক সিনেমাই উমার কাছে সব চেয়ে বড়। সব আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে যাক।'

'আহা, চল্‌ই না উমি।' হরিপদ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল। 'ভালো না লাগে উঠে এলেই হবে। ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই হলো তো। তবে আর ভয়টা কি। গান শোনা এমন কিছু খারাপ কাজ নয়।'

প্রকাণ্ড গাড়িটা তিনজন যাত্রী লইয়া উল্কার বেগে হাজরা রোড ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিল। প্রমোদের বাগানবাড়ি বেহালার দিকে। গাড়ির দীর্ঘ আসনের এক প্রান্তে উমা, মধ্যে হরিপদ ও অপর প্রান্তে প্রমোদ নিজে। গদির স্প্রীংয়ে সামান্য আন্দোলন ছাড়া

বিরাটকায় গাড়িতে গতির আর কোনও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া নাই। কিন্তু উমার রক্তের মধ্যে আবার সেই অবাস্তব বেহিসেবী বেপরোয়া ভাবটা মাদকতার ছোঁয়াচ লাগাইয়াছে। ঐশ্বর্য্যের সংস্পর্শে আসিলেই সে কেমন দুর্ব্বল ও লোভী হইয়া ওঠে। তখন তার সংযম-বোধ ও বিচার-বোধ যেন অবলীলাক্রমে শিথিল হইয়া যায়। হয়তো তার প্রকৃতিতেই ঐশ্বর্য্য এবং আরামের জন্য একটা দুর্নিরোধ্য ক্ষুধা আছে।

গাড়ি ডায়মণ্ডহারবার রোডের মোড়ে পৌঁছিলে সহসা হাঁকডাক করিয়া প্রমোদ শোফারকে গাড়ি থামাইতে বলিলেন। কহিলেন, 'ঐ যাঃ! ভুলে মেরে দিয়েছি! আমার যে নিউ মার্কেট থেকে ফুল কিনে নিয়ে যাবার কথা! নিকুঞ্জই যাচ্ছিল, আমিই বরঞ্চ তাকে বললুম, তুমি আর যাবে কেন, আমিই নিয়ে আসব'খন। দেখ তো কাণ্ড! এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, এখন উপায়!' প্রমোদের চওড়া কপালে চিন্তার রেখা ও মুখে উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল।

'খিদিরপুরের মোড়ে গিয়ে একবার দেখলে হয় না?' হরিপদ কহিল।

'ক্ষেপেছ!' প্রমোদের কণ্ঠে হতাশা। 'এ তল্লাটে সভায় হাজির করার উপযুক্ত ফুল পাবে কোথায়? তুমি একটা কাজ করো না, দত্ত। চট্ করে তিন নম্বরের একটা বাসে উঠে একেবারে নিউ মার্কেটের মোড়ে গিয়ে নাম, ওখান থেকে পছন্দমত ফুল কিনে একটা ট্যাক্সিতে সরাসর বেহালার বাগানে চলে এসো। আমি গিয়ে ওদিকটা সামলাই।'

'না না, দাদা নয়।' উমা আপত্তি করিয়া কহিল। 'দাদা ফুলের কিছু জানে না। যেতে হলে সবাইকেই…'

'জানিনে মানে! আমার চেয়ে ফুল ক'টা লোকে বেশি চেনে শুনি?' হরিপদ প্রতিবাদ করিল। 'জীবনে কম ফুলের তোড়া

কিনেছি! তখন রেস-কোর্সে যাই, একবার ডেভিড সাহেব 'বুকি'দের এক পার্টি দিলেন, তার জন্যে ফুল চাই। সাহেব ডেকে বল্লেন, ডাটা, এ ভার তোমায় নিতে হবে ...'

'ঠিক আছে। তুমি পারবে। এই নাও, একশো টাকার নোটটা রাখ।' বলিয়া প্রমোদ স্ফীতোদর মণিব্যাগ হইতে একটা একশো টাকার নোট বাহির করিয়া হরিপদর হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

• •

প্রমোদের মাস্টার বুইক আবার উর্দ্ধশ্বাসে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরিয়া বেহালা অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। এবার যাত্রী দুটি। প্রমোদ আর উমা।

উমা অনুযোগের স্বরে কহিল, 'কি অসভ্য বাবা! ছুতো করে' দাদাকে সরিয়ে দিলে তো!'

'ভদ্রলোকের ছেলের নামে এত বড় মিথ্যে দুর্নামও কেউ দেয়!' প্রমোদ লুব্ধ দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিয়া কহিলেন।

'জলসাটাও কি সত্যি, না ফুলের মতোই বানানো?'

'এটা নির্ঘাৎ সত্যি। তবে রাত বারোটার পরে শুরু হবে। তুমি তখন মায়ের কাছে।'

'দেখ, আমার বড় ভয় করে।' উমা মৃদুস্বরে কহিলেন।

'ভয় কিসের, উমারাণী।'

'ক'দিন ধরে শরীরটা কেবল বমি বমি করছে। শুনেছি নাকি বিপদের লক্ষণ।'

'যত বাজে কথা।' প্রমোদ গম্ভীরভাবে কহিলেন। 'আর যদি কিছু একটা হয়ই, তবেই বা কি? বিয়ে হয়ে গেলে সব শুদ্ধ। আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সময় নিয়েছি, দরকার হয় তার আগেই শুভদিনের খোঁজ করা যাবে। ভয় কি, উমারাণী! তবে, হ্যাঁ, আচ্ছা

এক কাজ করলে হয় না, কোন একজন মিড্‌ওয়াইফারি স্পেসালিস্টকে দেখিয়ে নিলেই তো সব সন্দেহ দূর হয়। মিছিমিছি ভয় পেয়ে লাভ কি?'

'মেজদা কি কিছু টের পেয়েছে মনে হয়?' উমা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

'পাগল, অমন হাবা-গবা মানুষ কথনও কিছু টের পায়! এমন না হলে ওকে এত খাতির করি। ও ভাবে, সব টাকা ও আমার কাছ থেকে জমির দালালিবাবদই পাচ্ছে। আহম্মক আর গাছে ধরে! এ যে প্রকারান্তরে তোমাকে উপহার দেওয়া, তা পর্য্যন্ত বেচারি আঁচ করতে পারে না।'

'সে যাই হোক, তুমিও আর দেরি করতে পারবে না।' উমা কহিল, 'বিয়ে হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্দি হই।'

'হবে, হবে, হবে। কিছু ভয় নেই, উমিরাণী।' বলিয়া প্রমোদ তাহাকে দু'হাতে খাব্‌লাইয়া কাছে আকর্ষণ করিল।

চৌদ্দ

ইহার পর মাসখানেক কাটিয়া গেছে। ছাঁটাইয়ের প্রথম কিস্তিতে কাশীপতিবাবুর নাম বাহির হয় নাই। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে না ছাড়িতেই খবর জানা গেল, শীঘ্রই দ্বিতীয় লিস্ট বাহির হইবে। কাশীপতি বুঝিলেন, তাঁহার আর রক্ষা নাই। যে আনুগত্যের জন্য সহকর্ম্মীদের কাছ হইতে তিনি ব্যঙ্গের 'রায় বাহাদুর' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কোন কাজেই লাগিবে না।

ক্রমেই তাঁহার মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়া উঠিতেছে। বাড়িতে সর্ব্বদা তিনি বকা-ঝকা করিতেছেন; এতে খুঁৎ ধরিতেছেন, ওতে দোষ পাইতেছেন। অফিস হইতে ফিরিলে যদি দেখেন, বাড়ির লোকেরা তাঁর জল-খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তবে রীতিমত চটিয়া ওঠেন। বলেন, অত নবাবী তাঁর পোষাইবে না; অফিস হইতে ফিরিলে একেবারে রাতের খাওয়া সারিয়া লইবেন। অথচ ভাত তৈরি করিয়া রাখিলে চটিয়া আগুন হন; জলখাবারের পয়সা ব্যয় করার অসামর্থ্য লইয়া হা-হুতাশ শুরু করেন, মান-অভিমান করেন।

বিরজাসুন্দরী সাক্ষেপে বলেন, 'দিন্‌কে দিন যা মেজাজ হচ্ছে!' রাগারাগির ঝুঁকিটা সবচেয়ে সুষমার উপর বেশি পড়িলেও সে কিন্তু চটে না; বাবার উপর সে ভারি একটা করুণা বোধ করে। যেন এক রুগ্ন শিশু ভুগিয়া ভুগিয়া খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছে, মায়ের উপর তার দৌরাত্ম্যের অন্ত নাই; অথচ মা ইহাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার মনে করিয়া সন্তানের প্রতি স্নেহে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছেন!

সেদিন সন্ধ্যার মুখে অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাশীপতি জামা-কাপড় বদ্‌লাইলেন। সুষমা তাড়াতাড়ি কাছে হাজির হইয়া কহিল, 'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, বাবা। আমি চা তৈরি করে' আনছি···'

'আবার চা কেন!' কাশীপতি বিরক্ত প্রতিবাদ করিলেন। 'তোদের কতদিন বলেছি, অত নবাবী আমার পোষাবে না। খাওয়ার ঘটা না কমালে···'

'একেবারে কি ভাতই খেয়ে নেবে?'

'ভাত হয়েছে?'

'হয়ে এলো বলে।' সুষমা কহিল।

'ঐ দেখো। এখনও মোটে হয়ই নি।' ত্রুটি ধরিবার একটা ছুতা পাইয়া কাশীপতি কহিলেন। 'সারাদিন ধরে' এই যে খেটে খেটে হয়রাণ হয়ে ফিরি, সেদিকে কি কারও খেয়াল আছে। বাড়ি ফিবে যে দুটো ভাত গিলব, তারও···'

'তুমি হাত-মুখ ধুয়েই এস না,' সুষমা কহিল। 'আমি ঠাঁই করে তোমাকে ভাত দিতে পারি কিনা দেখো···'

কাশীপতি যে প্রসঙ্গটা লইয়া আরও অভিযোগ জানাইবেন, তাহার পথ বন্ধ হইল। কিন্তু তখনও তাহার সঞ্চিত বিরক্তি নিঃশেষ হয় নাই।

সহসা তিনি কহিলেন, 'উর্মিকে দেখছি না যে! আবার বেড়াতে বের হয়েছে বুঝি? এই মেয়েটাকে নিয়ে যে আমি কি করব···'

'উর্মির মাথা ধরেচে।' সুষমা কহিল। 'ঘরে শুয়ে আছে, ডাকব?'

'আবার মাথা ধরা কেন! এই বয়সে মাথা ধরা! এমন বাবু মেয়ে হয়েছে ওটা!' কাশীপতি যুৎ করিতে না পারিয়া কহিলেন।

'ঐ তো ভাতের ফেন গালা হচ্ছে।' রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া সুষমা নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল। 'যাই, আমি ঠাঁই করে' দিই গে...'

কিন্তু কাশীপতি বাধা দিলেন। প্রশ্ন করিলেন, 'ঘরে চিনি আছে?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'তবে আগে এক পেয়ালা চা-ই বানা দিকি। কম করে' চিনি দিবি...'

কাশীপতি আর বাক্যব্যয় না করিয়া কলতলার দিকে আগাইয়া গেলেন। সুষমা মনে-মনে প্রচুর কৌতুক বোধ করিয়া রান্নাঘরের দিকে যাত্রা করিল। এই বয়স্ক শিশুটিকে সে ছাড়া আর কেহই এত সহজে বাগ মানাইতে পারে না।

সুষমা দু'পেয়ালা চায়ের উপযুক্ত জল চড়াইল। চা যখন হইতেছেই, তখন উমাকেও এক কাপ দিবে। চায়ে মাথা ধরা ছাড়িতে পারে। কিছুকাল হয়, প্রায় নিত্যই তার মাথা ধরিতেছে। মা বলেন, 'পিত্তি'। দু'একদিন মাথাধরার প্রাবল্যে সে বমি পর্য্যন্ত করিয়াছে। উমার শরীর মজবুত নয়, এত ঘোরাঘুরি হৈ-হৈ কি তার সহ্য হয়, সুষমা সহানুভূতির সঙ্গে ভাবে।

ইদানীং উমা যেন অনেকটা সংযত হইয়াছে। আগের সেই ছুটাছুটি নাই, জিনিষপত্রের জন্য আগেকার মত বায়না নাই; নিত্য সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। শত হোক, সে তো বোকা মেয়ে নয়। হরিপদ এবার প্রমোদবাবুকে চাপিয়া ধরিয়াছে; সে আশা করে, শীঘ্রই বিবাহের কথা পাকা করিতে পারিবে। এখানে উমার বিয়ে হইলে বড়ো ভাল হয়। বড় ঘরে না পড়িলে উমার চলিবে না। বরের অনেক টাকা থাকা চাই। কেৎলিতে চায়ের জল চড়াইয়া সুষমা এইসব ভাবিতে লাগিল।

সদর-দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনিয়া ঘরে না ফিরিয়া কলতলা

হইতেই কাশীপতি দরজা খুলিতে গেলেন। ভাবিয়াছিলেন, তারাপদ। সে-ই এ সময় বাড়ি ফেরে। তারাপদর পরিবর্ত্তে প্রকাশকে দেখিতে পাইলেন।

'তারাপদ কি বাড়ি ফিরেছে?' প্রকাশ একটু দ্বিধা করিয়া প্রশ্ন করিল।

'না, এখনও ফেরেনি তো।' কাশীপতি জানাইলেন।

'তার ফিরতে বোধ হয় রাত হবে। ভাবলুম, খবর দিয়ে যাই। একটা মিটিং...'

'মিটিং, মিটিং আর মিটিং!' কাশীপতি অননুমোদনের কণ্ঠে কহিলেন। 'সময়মতো খাওয়া নেই, জিরোনো নেই, কেবল হৈ-হৈ। এই তো তুমিও আছ, একই জায়গায় কাজ করো, কই, সারাক্ষণ তো এত সব হুজুগে...'

'তারাপদ আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের মানুষ!' প্রকাশ বিনীত-ভাবে জানাইল। 'সকলের অভাব-অভিযোগে তাই বুক বাড়িয়ে দিতে পারে। সে বড় বংশের ছেলে, তার উদারতাই...'

বড় বংশের প্রশংসা শুনিয়া কাশীপতি নরম হইলেন। কহিলেন, 'বসবে?'

'আজ্ঞে, আপনার কাছে একটু দরকার ছিল।' প্রকাশ দ্বিধার সঙ্গে কহিল।

'আমার কাছে! বেশ তো!' কাশীপতি সহজেই প্রয়োজন জানাইবার অনুমতি দিলেন। 'ঘরে বসবে? তা না হয়, ঘরেই চল।'

তারাপদর ঘরের বৈঠকখানা-অংশের ফরাসটির উপর বসিয়া কাশীপতি কহিলেন, 'কি দরকার বলো তো? তারাপদর প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু...'

প্রকাশ বসিল না। দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঈষৎ দুর্ব্বল কণ্ঠে কহিল, 'কথাটা তুলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু আপনি আমার পিতৃতুল্য, অপরাধ হলে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন...'

কাশীপতি মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশের কারখানায় তার অংশীদার হওয়া সম্পর্কে তারাপদ একদিন যে প্রস্তাব করিয়াছিল, প্রকাশ যে তাহার পুনরুত্থান করিতে চাহিতেছে, তাহা তিনি সহজেই বুঝিলেন। প্রকাশ ছোট বংশের ছেলে; কাশীপতিকে তাহার অংশীদার হইতে ডাকার মধ্যে যে একটা দুঃসাহসিকতা রহিয়াছে, ইহা সে বুঝিতে পারায় কাশীপতি নিজের অজ্ঞাতসারেই খুশি হইয়া উঠিলেন।

তারাপদের সঙ্গে এ-বিষয়ে তর্কের পর প্রস্তাবটা সম্পর্কে কাশীপতি আরও ভাবিয়া দেখিয়াছেন। শত হোক, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মিস্ত্রীর কারখানা খুলিয়া পরে হেন্‌রি ফোর্ড জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন। কারখানার মালিক হওয়ার মধ্যে অপমানের কিছু নাই। হইলই বা ছোট কারখানা; ছোটই একদিন বড় হইয়া ওঠে। আধুনিক জগতে মোটর ও যন্ত্রপাতির কারখানার মতো চালু ব্যবসা আর কি? এক বস্তিবাসী বলিয়া প্রকাশের অংশীদার হইতে আপত্তি। ভাবিয়া দেখিলে এই আপত্তিরও মানে হয় না। নৈকষ্য কুলিন ব্রাহ্মণও ধনী সাহা-গন্ধবণিকদের গদিতে চাকরি করে। শত হোক, তারাপদ ও প্রকাশ কৌলিন্যে আলাদা হইলেও কাজের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীভুক্ত; ছোট বংশ এবং বস্তিবাসী বলিয়া প্রকাশকে একেবারে তাচ্ছিল্য করা চলে না। প্রকাশ অভদ্র বা ফাজিল ছেলে নয়; সে সম্মানী লোকের সম্মান দিতে জানে। তাহার সাথে লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে আপত্তি কি?

'প্রথমেই আমার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে,' প্রকাশ বিনীতস্বরে কহিল, 'দু-একটি কথা জানাতে চাই। অফিসে তারাপদ আর আমি একই কাজ করি, প্রায় সমান সমানই মাইনে পাই। গলির মোড়ে সম্প্রতি আমি ছোটখাট একটা মোটর-মেরামতি কারখানা খুলেছি দেখে থাকবেন। প্রথম দু-মাস বড় একটা সুবিধে হয়নি, কিন্তু গত দু'তিন মাস ধরে প্রতিমাসে গড়ে তিনশো চারশোর মত আয় হচ্ছে। আশা হচ্ছে, আর কিছু খরচ-পত্র করে যদি...'

কাশীপতি ভাবিতে লাগিলেন, অংশীদারি দিবার জন্য ছেলেটা কত টাকা দাম চাহিবে? দু'হাজার, তিন হাজার, পাঁচ হাজার? চার হাজার পর্য্যন্ত হইলে তিনি প্রস্তাবটা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহার চেয়ে বেশি চাহিলে কোথা হইতে দিবেন?

'কাজেই আয়ের দিক থেকে', প্রকাশ দ্বিধাভরে কহিল, 'এক রকম স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। টাকার অঙ্কটা খুব বেশি নয়, তবে ভদ্র-ভাবে সংসার চালাবার...ভদ্র হওয়ার জন্য, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো যোগ্যতা অর্জ্জন করবার জন্য ছেলেবেলা থেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করে এসেছি। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করেছি। যে গরিব, সে কখনও সম্ভ্রান্ত হ'তে পারে না, স্বাধীন হ'তে পারে না, ইচ্ছেমত নিজেকে বাড়াতে, বদ্‌লাতে তৈরি করতে পারে না, এ-তো নিজের চোখেই সর্ব্বদা দেখছি। ভগবানের ইচ্ছায় এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে এবার বোধহয় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছি।... এবার আমি ভদ্র হয়ে উঠতে চাই, নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই, উঁচু স্তরের মানুষদের সঙ্গে মিশতে চাই। আপনার কাছে এই প্রার্থনা নিয়েই এসেছি। জানি, এ হয়তো আমার দুঃসাহস, কিন্তু...সুষমা দেবীকে কি আমি বিয়ে করতে পারি?...হয়তো আমি তার যথেষ্ট যোগ্য নই, তবুও...'

'বিয়ে! সুষিকে?' কাশীপতি স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন। তিনি ব্যবসায়ের প্রস্তাবের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বিবাহের প্রস্তাবের জন্য নয়। তিনি রীতিমত ধাক্কা খাইলেন। একে তো ছোট বংশে মেয়ের বিবাহ দেওয়া তাহার কল্পনাতীত; তার উপর বস্তির ছাপ প্রকাশকে অগ্রহণীয়ের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এ-সম্বন্ধে কাশীপতির দ্বিধার অবকাশ নাই; তাঁর সিদ্ধান্ত আগে হইতেই স্থির হইয়া আছে। বিরজাসুন্দরী ইতিপূর্ব্বে একদিন এ-সম্পর্কে তারাপদর ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে আসিয়া ধমক খাইয়াছিলেন। এখন স্বয়ং পাত্রকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দেখিয়া কাশীপতি ইহাকে চরম নির্লজ্জ ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিলেন এবং একমুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া উঠিলেন।

কাশীপতিকে নীরব দেখিয়া প্রকাশ আবেদনের কণ্ঠে কহিল, 'আপনার অনুমতির উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আপনি যাতে আমাকে অযোগ্য মনে না করেন, মাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেকে আমি তৈরি করতে চেষ্টা···'

'না, সে হতে পারে না।' কাশীপতি গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন।

প্রকাশ অপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাশীপতির কঠিন মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার ব্যাকুল আর্জ্জি এবং বহু বৎসরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেহ যে মাত্র সামান্য কয়েকটি শব্দে উড়াইয়া দিতে পারে, তাহা যেন অবিশ্বাস্য বোধ হইল।

'আমি বড় বংশের ছেলে নই, তাই কি আপনার আপত্তি?' অবশেষে সে মরিয়ার মত কহিল।

'নয় কেন?' কাশীপতিও কঠিন হইয়া কহিলেন। 'বংশ উড়িয়ে দেবার মতো নয়। যারা হট্ করে' কৌলিন্য বিসর্জ্জন দিয়ে বসে, আমি তাদের দলে নই। কিন্তু এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে।

তুমি ভদ্র হতে চেষ্টা করছ, ভাল কথা, সুখের কথা; কিন্তু পাত্র নিজে এসে বিয়ের প্রস্তাব তুলবে, বলি এইটেই কি ভদ্রসমাজের রীতি? এ রকম বেয়াড়া সাহস তো অমনি হয় না; তারাপদ আস্কারা দিয়ে থাকবে! সে রুশিয়া-সোভিয়েট করে, জাত মানে না, শ্রেণী মানে না, ধর্ম্ম-ভগবান মানে না। যদি তার কথা শুনে মনে করে' থাক, এ-বাড়ির অন্যান্যেরাও…'

'তারাপদ বা অন্য কেউ আমাকে কোনও আস্কারা দেয়নি।' প্রকাশ গম্ভীরভাবে কহিল। 'আমি নিজের মনের প্রেরণায়ই যা জানাবার আপনার কাছে জানিয়েছি। আমি নিচু বংশে জন্মেছি, সে কি আমার দোষ? বাবার মৃত্যুর পর নিরুপায় হয়ে আমার মা বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, দুধ বেচে, ঘুঁটে বেচে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, বড় করেছেন, এ কি আমাদের কোনও অপরাধ? আমরা নিজেরা তো কখনও এমন কিছু করিনি, যার জন্য লজ্জিত হ'তে হবে। গরিবের পক্ষে যথাসাধ্য লেখাপড়া শিখেছি, ভালো ছেলেদের সঙ্গে ছাড়া মিশিনি; আপনার ছেলে তারাপদ আমার একমাত্র বন্ধু। আপনাদের মতো করে' চলতেই অভ্যস্ত হয়েছি। তবে কি আমার অপরাধ? কেন আমাকে এমন তাচ্ছিল্য করবেন, এমন ছোট করে' রাখবেন? স্বাধীন ভারতে সব মানুষই নাকি সমান। কিন্তু তুচ্ছ বংশ-মর্য্যাদার অভাবের দরুণ…'

'বংশ-মর্য্যাদা তোমার কাছে তুচ্ছ হ'তে পারে', কাশীপতি রাগান্বিত ভাবে কহিলেন, 'আমার কাছে সেটা তুচ্ছ নয়, সেটা বড় কথা। বংশের বিরুদ্ধে কারুর কাছ থেকে আমি লেক্‌চার শুনতে প্রস্তুত নই…তুমি তারাপদর বন্ধু, বাড়িতে আসা-যাওয়া করছ, এতে কখনও আপত্তি করিনি। কিন্তু তার পরিণতি যে এতদূর গড়াবে, তা স্বপ্নাতীত ছিল। এখন সবই বুঝতে পারছি।

তা হলে এর মধ্যে সুবিধও আছে! বাঁদ্‌রি মেয়ে, বাঁদ্‌রামির আর জায়গা…'

'দেখুন, আপনি ভুল করছেন।' প্রকাশ ভীতভাবে কহিল। 'এতে তিনি আসেন কি করে'? তিনি এর কিছুই জানেন না। এটা শুধু আমারই কথা। আর কারুর মতামতই আমার জানা নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়েই আমি এমন মূর্খতার পরিচয় দিয়েছি। এর দায়িত্ব সবটাই আমার।…আমার অপরাধ হয়েছে। আমি এখন যাই। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি পিতৃতুল্য, সন্তানের অপরাধ…' বলিতে বলিতে প্রকাশ দরজার দিকে প্রায় পিছু-হাঁটা শুরু করিল।

'হুঁ, শোন,' কাশীপতি শেষ বারের মতো গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'আমি ভেবে দেখলাম, এর পর আর তোমার এ-বাড়িতে আসা…'

'আজ্ঞে না, আর আসব না।' দরজার কাছ হইতে প্রকাশের বিকৃত কণ্ঠ শোনা গেল।

পনেরো

বেলা দেড়টা বাজিয়া গেছে। মাকে স্নানে পাঠাইয়া সুষমা রান্নাঘরে বসিয়া আছে। হরিপদ সেই সকালে বাহির হইয়াছে, এখনও ফেরে নাই। তাহার জন্যই দেরি হইতেছে, নইলে সুষমা এতক্ষণে খাইয়া লইত। তারাপদ কিছুক্ষণ আগে আসিয়া খাইয়া গ্যারেজে ফিরিয়া গিয়াছে। উমারও খাওয়া হইয়া গেছে। সে খাইতে চাহে নাই ; সুষমার সঙ্গে বসিয়া খাইবে বলিয়া দেরি করিতে চাহিয়াছিল। সুষমাই জোর করিয়া তাকে খাওয়াইয়া শুইতে পাঠাইয়াছে। সে বেচারির শরীরটা কেমন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। উৎসাহ নাই, চাঞ্চল্য নাই, ক্ষিধে হয় না। তারপর প্রায়ই মাথা ধরে। আরও নানান্ উপসর্গ লাগিয়াই আছে।

কড়াতে করিয়া উনানে জল চাপাইয়া সুষমা তাহার উপর ভাতের হাঁড়িটা বসাইয়া দিল। ঠাণ্ডা ভাত হরিপদ খাইতে পারে না। কিন্তু পড়ন্ত আঁচে ভাত গরম রাখা কম হাঙ্গামা নয়।

গৃহস্থালির এই সব খুঁটিনাটির প্রতি সুষমা সর্ব্বদাই সজাগ। জীবনে তার কোনও বড় আকাঙ্ক্ষা নাই। ছোট্ট একটা গৃহ সুন্দর ও সুবিধাজনক করিয়া রাখিতে পারিলেই সে তৃপ্ত বোধ করিতে পারে। কিন্তু তার একটা নিজস্ব গৃহ চাই, যেখানে সে-ই গৃহিণী, সে-ই কর্ত্রী, যে-গৃহের সকল দায়িত্ব, সকল দুর্ভাবনা তার একলার।

প্রকাশ গত সন্ধ্যায় কাশীপতির সঙ্গে কোন্ প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছে, তাহা স্বকর্ণে না শুনিয়াও সে একটা আন্দাজ করিয়া লইয়াছিল। কোনও ছুতায় দু-পা কাছে আগাইয়া গিয়া একটু আড়ি পাতিতেও ইচ্ছা হয় নাই, এমন নয়। কিন্তু অনুচিত কার্য্য

বিবেচনা করিয়া রান্নাঘর হইতে সে এক পা-ও নড়ে নাই। তৎসত্ত্বেও সব কিছুর উপরই সে সাগ্রহ নজর রাখিয়াছে। কেবলই মনে হইয়াছে, ঐ ছোট্ট ঘরটুকুর মধ্যেই তার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিরূপিত হইতেছে। বিরজাসুন্দরীর বিভিন্ন ফরমাসঅনুযায়ী কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়াও তাহার মন কম্পাসের কাঁটার মতো একই লক্ষ্যে অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছিল। এমন সময় প্রকাশ ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। কাশীপতিকে অনুসরণ করিয়া সে যখন তারাপদর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তার সসঙ্কোচ ভাবটা সুষমা লক্ষ্য করিয়াছিল; যখন বাহির হইয়া আসিল, মনে হইল, একটা ধরা-পড়া চোর নিতান্ত গৃহস্থের দয়ায় ছাড়া পাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া পালাইতেছে। কোনও দিকে না চাহিয়া প্রকাশ যেন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুষমা সবই লক্ষ্য করিল। কি ঘটিয়াছে বা ঘটে নাই, সে কিছুই জানে না, তবু একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। বাবার যা বংশের জাঁক, তিনি কি বংশ-মর্য্যাদা খাটো করিতে রাজি হইবেন! বেচারি বাবা!

ইহার পর প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পার হইয়া গেছে। জনশূন্য রান্নাঘরের দরজার একপাশে পিঁড়িতে বসিয়া দরজার একপাটে ঠেস্ দিয়া সুষমা আবার সেই সব এলোমেলো কথা ভাবিতেছে। এক ভাবা ছাড়া আর সে কি করিতে পারে? এমন সময় নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই তার দৃষ্টি সদর-দরজার দিকে গেল। দরজা খোলার কোনও আওয়াজই তার কানে আসে নাই, কিন্তু দেখিল, হরিপদ ভিতরে ঢুকিয়া একবার ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিয়া অতি নিঃশব্দে বারান্দার সিঁড়ির দিকে আগাইয়া আসিতেছে। তার চলার এই ভঙ্গিটাই সুষমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, নহিলে এদিকে আর নজর না দিয়া সে খাবার গরম করার দিকে মন দিত।

হরিপদ চুপে চুপে সুষমাদের ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার চারদিকে সতর্ক ভীত দৃষ্টি প্রেরণ করিল। অতঃপর কোটের পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া ভেজানো-দরজা ঠেলিয়া সে ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

এই লুকোচুরি সুষমা কিছুদিন ধরিয়াই লক্ষ্য করিতেছে। উমার সঙ্গে ফিস্‌ফাস্ করিয়া প্রায়ই হরিপদ নানা সলামর্শ করে; তাহার গতিবিধি আবার রহস্যজনক হইয়া উঠিয়াছে। সুষমার প্রশ্নের জবাবে উমা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলে না। জবাবটা ধোয়া করিয়া হয়তো বলে, 'যেমন একবার আস্কারা দিয়েছেন, এবার তার ঠেলা সামলান।' ইহার চাইতে বেশি বোধগম্য আর কিছু উমার কাছ হইতে আদায় করা যায় নাই। সুষমার সন্দেহ হয়, কোন একটা চিঠি লেখালেখির ব্যাপার চলিতেছে। এই লেখালেখির মাধ্যম তাহার মেজদা এবং এক পক্ষ উমা। ব্যাপারটা সুষমার কাছে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ বলি-বলি করিয়াও মাকে সে কথাটা বলিতে পারিতেছে না। সঙ্কোচ হইতেছে, উমার প্রতি মায়া হইতেছে, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ের জন্য নিজেকে কেউ এত ছোটও করিতে পারে!

'সুষি কোথায় গেলি, খেতে দে।'

'চান হয়ে গেছে?'

'বাঃ রে, চান করে' বেরুলুম না? জানতুমই, ফিরতে দেরি হবে। আমি জুতো ছেড়ে আসছি, তুই ঠাঁই কর।' হরিপদ রান্নাঘরের কাছাকাছি হাজির হইয়া কহিল।

'ঠাঁই আমার করা আছে।' সুষমা কহিল।

'মা কোথায়?'

'চানে গেছেন।'

'হ্যাঁ, দেখ', হরিপদ সহসা গলা খাটো করিয়া কহিল, 'একটা কথা উর্মির কাছ থেকে জেনে নিবি? প্রমোদবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করে' বসেনি তো? যা মেজাজ! আমরা বলে চার হাত এক করবার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছি, ইদিকে উনি হয়তো মেজাজ করে' সব ভণ্ডুল...'

'তা কি করে' হবে।' সুষমা অবাক্ হইয়া কহিল। 'উর্মি আর ও-বাড়ি যায় নাকি যে ঝগড়া করবে?...'

'না, না, আমি তা বলছি না।' হরিপদ থতমত খাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল। 'ব্যাপার কি জানিস, সেই নেমন্তন্নে না যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে প্রমোদবাবুর বাড়ির মেয়েরা বিলক্ষণ চটে আছে। ভাবলুম, মন্টিরাণী যদি এ সম্বন্ধে ওকে কিছু লিখে-টিকে থাকে...'

'আমি কিছুই জানিনে।' সুষমা কহিল।

'দেখতো একবার কাণ্ড! গেঁয়ার্ত্তুমির ফলে এমন একটা সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।' হরিপদ ন্যায্য প্রতিবাদের কণ্ঠে বলিল। 'তারা কত বড় সম্মানী মানুষ, একবার ভেবে দেখ্‌লি নে; হুট্ করে' গাড়ি ফিরিয়ে দিলি। নেহাৎ অনুগ্রহ করেই তারা আমাদের মতো হেজিপেজির সঙ্গে ভদ্রতা করছে, সেটা বুঝলি নে। এবার যদি তারা বেঁকে বসে, তবে কুটুম্বিতের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, এত বড় একটা মুরুব্বি পর্য্যন্ত হারাতে হবে। বড়লোক মক্কেলের কাছ থেকে করে' খাচ্ছিলাম, তা পর্য্যন্ত কারুর সহ্য হলো না!...নে, তুই ভাত বাড়। বৈঠকখানার চেয়ারে তিন তিনটি ঘণ্টা ধর্ণা দিয়ে পড়ে' রইলুম, অথচ কিচ্ছু ফায়দা হলো না। লাভের মধ্যে ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।...যাই, জুতোটা ছেড়ে আসি...'

ভাতের হাঁড়ি উনানের উপরকার ফুটন্ত জলপূর্ণ কড়া হইতে নিচে নামাইয়া সুষমা থালা সংগ্রহ করিবার জন্য এদিক ফিরিল।

দেখিল, উমা বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'আবার কোথায় যাচ্ছিস্?'

'রমাদের বাড়ি।' ধরা পড়িয়া উমা ঈষৎ চম্‌কাইয়া উঠিল। 'একটু ঘুরে' আসি, দিদি ভাই...'

'শরীর ভালো নয়, আবার রোদ্দুরে বেরুচ্চিস?' সুষমা অসন্তুষ্ট স্বরে কহিল।

'একটু কাজ আছে। যেতেই হবে।'

'কাজ তো তোর সর্ব্বদাই লেগে আছে। শীগ্‌গির ফিরে আসিস্। নইলে আমাকেই মায়ের কাছে বকুনি খেতে হবে, শুনছিস্?'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' বলিয়া উমা সদর-দরজার দিকে আগাইয়া গেল।

রমাদের বাড়ি যাইবার কোনও চেষ্টাই উমা করিল না। বাড়ি হইতে বাহির হইবার আধঘণ্টা পরে হাতিবাগানের চৌধুরিদের ছোট তরফের আলিপুরের অট্টালিকার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

সিঁড়ির মুখে তাজি বেয়ারা প্রথামত হিজ্‌মাস্টার্স ভয়েসের অনুগত কুকুরটির ভঙ্গিতে নিশ্চুপ বসিয়া আছে। উমাকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে সেলাম করিল এবং আদেশের অপেক্ষা না করিয়া উমার সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ চৌধুরির খাস্-কামরার দরজার সম্মুখে হাজির হইল। কিন্তু উমার ভিতরে ঢোকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল না; স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো আবার নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল।

ইহার ধরণ-ধারণে এক সময় উমা ভারি মজা পাইত। আজ কিন্তু তাহার সঙ্গে আসা বা ফিরিয়া যাওয়া, কোনও কিছুই সে লক্ষ্য করিল না।

লাল্ চামড়ার গদি-আঁটা ক্রোমিয়মপ্লেটের কৌচে বসিয়া ক্রোমিয়মপ্লেটের ঠ্যাং-বিশিষ্ট ছোট একটা টেবিলে বহু জড়ানো, আধ-জড়ানো এবং খোলা জমি ও বাড়ির বিভিন্ন দলিল-নক্সা লইয়া প্রমোদ চৌধুরি ছোটছেলের পুতুল খেলার মত অনায়াসে নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন। মুখের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড পাইপ; তাহা হইতে প্রচুর ধোঁয়া উঠিয়া তাহার মুখটা নিরন্তর ঝাপ্‌সা করিয়া তুলিতেছে। এক পায়ের উপর অন্য পা তোলা। সিল্কের পাজামা-মোড়া হাঁটুর উপর মোটা একটা চিঠির কাগজের প্যাড্। হাতে পেন্সিল। প্যাডের কাগজে নানা জটিল রেখাপাত হইতেছে। নতুন বাড়ি তৈয়ারি ও বাড়ি বেচা প্রমোদের অন্যতম শখ। ইহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসাও বটে। তাহার রক্তের মধ্যে স্থাবর-সম্পত্তির জন্য এই আসক্তি মিশ্রিত আছে। অন্য ব্যবসায়ের ঝুঁকি না লইয়া তিনি এই ক্ষতি-আশঙ্কাহীন ধ্রুব ব্যবসায়টিই বাছিয়া লইয়াছেন।

কার্পেটের উপর দিয়া উমার আগাইয়া আসার অতি ক্ষীণ শব্দ শুনিবার ফুরসৎ প্রমোদের ছিল না। তখন সে হাজার এবং লাখের হিসাবে মশগুল হইয়া আছে। কিন্তু উমা কাছে আসিয়া দাঁড়াইবার পরও পাঁচ-সাত সেকেণ্ড সে কিছু টের পাইল না; নিজের কাজেই ডুবিয়া রহিল।

মানুষের উপস্থিতির একটা নিজস্ব আহ্বান আছে। এই ডাক শব্দ-নিরপেক্ষ। সহসা প্রমোদ এই উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। দ্রুত কাগজ-পত্রের স্তূপের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া সে অতি কাছাকাছি উমাকে আবিষ্কার করিল।

'এই যে! অসময়ে হঠাৎ কি মনে করে?...বসো।'

'তুমি কি আরম্ভ করেছ, শুনি?'

প্রমোদ প্রশ্ন-বোধক দৃষ্টিতে উমার দিকে তাকাইলেন।

'এতগুলো চিঠি লিখলাম, তার একটারও জবাব দিলে না? এমন যে তুমি কখনও করতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি।' উমা অভিযোগপূর্ণ অভিমানের স্বরে কহিল। 'ভাবলাম, কি হলো। চিঠি কি তোমার হাতে একটাও পৌঁছায় নি। অনুপায় হয়ে মেজদার হাতে চিঠি পাঠালাম।...কিন্তু নিত্যি এসে তিনি ফিরে যান, একদিনও তোমাকে ধরতে পারেন না। দারোয়ান একদিন বলে, বাড়ি নেই; অন্য দিন বলে, দেখা করতে দেওয়ার হুকুম নেই। আমি ত অবাক্‌ হয়ে গেছি। মেজদারও দেখা করার হুকুম নেই, এ-ও কি সম্ভব! কোথায় যেন কিছু গোলমাল হয়েছে। আর কোনও উপায় না দেখে আমি নিজেই...'

'বেশ করেছ। বসো।' প্রমোদ কাগজে একটা আঁক কাটিয়া কহিলেন। 'দারোয়ানেরা হরিপদকেও হাঁকিয়ে দিয়েছে বুঝি? ওরা বুঝতে পারেনি। দালালদের ছেড়ে দিতে নিষেধ করা আছে; ওরা দালালে দালালে তফাৎ করতে শেখেনি। বলে দিতে হবে...তারপর? রোদের মধ্যে আসতে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়...'

'আচ্ছা লোক যা হোক্‌!' উমা অভিযোগের কণ্ঠে কহিল। 'ভয়ে আমি মরে যাচ্ছি, বিপদে দু' চোখে অন্ধকার দেখছি, আর ইদিকে তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছ, একবার খোঁজও নিচ্ছ না।...এবার শীগ্‌গির কর, আর যে ঢেকে রাখা যায় না। এবার যে সবাই টের পেয়ে যাবে। বৈশাখের পনেরো তারিখে দিন আছে...'

'দিন!' প্রমোদ সবিস্ময়ে চোখ উঠাইলেন।

'হ্যাঁ, বিয়ের দিন।' উমা অন্তরঙ্গতার নিচুস্বরে কহিল। 'মনে নেই, তুমি এবার বৈশাখ মাসের মাঝামাঝির কথা বলেছিলে? আর দেরি করো না। এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি হলে কেলেঙ্কারি হবে...'

'ও এমন কিছু নয়।' প্রমোদ এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া মামুলি গলায় কহিলেন। 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেই এসব ছোট-খাট হাঙ্গামা মিটিয়ে দিতে পারে।' বলিয়া আবার নক্সার কাগজে চোখ ন্যস্ত করিলেন।

'এ তুমি বলছ কি!' উমা স্তম্ভিত হইয়া কহিল। 'এও কেউ করে!'

'কত মেয়ে করে।'

'ছিঃ, আমি কি তেমন! আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু আমি ভালো বংশের মেয়ে। গুপ্তিপাড়ার দত্তদের বাড়ির মেয়ে আমি!' গুপ্তিপাড়ার যে দত্তদের কৌলিন্যের কথা উঠিলেই উমার হাসি পাইত, বিপদের মুখে তৃণ আঁকড়াইবার মতো সেই বংশ-মর্য্যাদাই উমা আঁকড়াইয়া ধরিল।

'বড় ঘরের মেয়েরাই তো এসব করে' থাকে।' প্রমোদ গম্ভীরভাবেই কহিলেন। 'এ কিছুই কঠিন নয়। সামান্য কিছু টাকার মাম্‌লা।'

'না না, ছি! এ ভয়ানক পাপ! এতে ভারি পাপ হয়।'

'পাপ কিছুতেই হয় না। ওটা কুসংস্কার।'

'এসব করতে গিয়ে কত মানুষ মরে যায়।' উমা মরিয়া হইয়া কহিল। 'যদি মরে যাই…'

'এত ভয়!' প্রমোদ কহিলেন। 'প্রেমের জন্য সীতাদেবী অ্যাক্সে অগ্নি-প্রবেশ করেছিলেন, সাবিত্রী যমের পিছু অনুসরণ করেছিলেন, আর তুমি সামান্য অপারেশন-টেবিল…'

উমা ভীতমুখে প্রমোদের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিল। সে রীতিমত শঙ্কিত হইল। সহানুভূতিহীন, নির্ব্বিকার, নিরুদ্বেগ মুখ; কাহারও বিপদে সামান্য ভ্রুক্ষেপও তাহাতে নাই।

'কিন্তু এ আমি করতে যাব কেন?' উমা দৃঢ়স্বরে কহিল। 'তুমি তো সব লজ্জা, সব কলঙ্ক থেকে আমাকে বাঁচাতে পার। তুমি কি আমার কাছে দিব্যি কাটো নি? বলো নি, সব লজ্জার হাত থেকেই তুমি আমাকে বাঁচাবে? নাও, রঙ্গ রাখো। ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপচে। এমন ঠাট্টা এখন আর ভালো লাগে না।...এখনও যদি তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়, কেউ কিছু টের পাবে না...'

'যা সম্ভব নয়, তার জন্য মিছিমিছি হা-হুতাশ করে' কার আর কি লাভ হচ্ছে।...এক সেকেণ্ড, তাজি মহাপ্রভুর কানে একটু বেল্ বাজিয়ে দেওয়া দরকার।' প্রমোদ কাগজপত্র হইতে চোখ উঠাইলেন।

'কেন, কেন সম্ভব নয়?' উমা তাহার প্রশ্ন আঁক্‌ড়াইয়া রহিল।

'যা করবার ইচ্ছে নেই, তা সব সময়েই অসম্ভব। নইলে অনেক আগেই সেটা সমাধা হ'তে পারত। আর শুধু কি তাই, খান্‌দানি বংশে, তোমার চেয়ে অনেক খাপ্‌সুরৎ তন্বী তরুণীর সঙ্গেই তা হ'তে পারত। সেটা যে কোনও বুদ্ধিমতীরই বোঝা উচিত ছিল। পণ্ডিতেরা তো বলেই রেখেছেন, 'ভেবে কাজ করবে কাজ করে'...'

'তুমি কি মানুষ!' স্তম্ভিত উমার কণ্ঠ হইতে মাত্র তিনটি শব্দ ছিট্‌কাইয়া বাহির হইল।

'আলবৎ মানুষ। কেবল মানুষ নয়, বড়মানুষ।' প্রমোদ থিয়েটারি সুরে কহিয়া উঠিলেন। 'বড়লোক হলেই টাকা, টাকার সদ্‌গতি করতে হয়! সব ধনী-ব্যক্তির এ একটা মহান্ কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করে সদ্‌গতি কর্‌ব? আমার পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষেরা বাইজি নাচাতেন, রক্ষিতা পুষতেন। টাকা ডানা মেলে উড়ত, যজ্ঞের আগুনে দাউ-দাউ করে' পুড়ত। আমিও টাকার যজ্ঞে পিছ-পা নই, কিন্তু বাজারের মেয়েমানুষে চলবে না। আধুনিক কালের আমরা সেকেলে কায়দা বরদাস্ত করতে পারিনে...এই যে, তাজি-সাহেব,

এনেছ, দাও।' বলিয়া প্রমোদ তাজি বেয়ারা আনীত বীয়ারের বোতলটার প্রতি অনুমোদনের দৃষ্টিতে চাহিলেন।

তাজি নিঃশব্দেই ট্রে সাজাইয়া হাজির হইয়াছে। ইতিমধ্যে বোতাম টিপিয়া কখন বেল্ বাজানো হইয়াছে উত্তেজিত উমা কিছুই টের পায় নাই, কিন্তু বেলের ইঙ্গিত তাজি বুঝিয়া লইয়াছে। সব কথা এত সহজে বুঝিতে পারে বলিয়াই তাজি এমন পেয়ারের ভৃত্য। এমন সুবিধাজনক লোক আর হয় না। উপরতলার সব ঘটনাই সে চোখে দেখে, অথচ মুখ ফুটিয়া সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পারে না। বোবা হওয়া বড় গুণ!

প্রমোদ এমন ভৃত্যকে মূল্যবান মনে করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি!

'হ্যাঁ, কি বলছিলাম,' তাজি বীয়ার পরিবেশন করিয়া প্রস্থান করিলে প্রমোদ কহিলেন, 'আধুনিক কালের আমরা বাজারের মেয়েমানুষ সহ্য করতে পারিনে। আমাদের রুচিতে বাধে। তবে উপায়? উপায় ভদ্র-পরিবারের ভদ্র মেয়ে; আধুনিক স্মার্ট মেয়ে। এইখানে পৈতৃক অর্থ আমাদের খুবই সাহায্য ক'রে থাকে।...এরই মধ্যে তোমার হাঁদা-রাম দাদাটিকে তোয়াজে রাখতে আমার কত টাকা ব্যয় হয়েছে শুনবে? বেশ একটু মোটা অঙ্কই হবে।...তবে, হ্যাঁ, তুমি একটু বিপদে পড়েছ। ও এমন কিছু নয়! জঞ্জাল দূর করে এস, যেমন চলছিল, আবার তেমনি চলবে। যা খরচ লাগবে তার জন্য ভাবনা করো না...'

উমা দুই চোখে অন্ধকার দেখিল! মনে হইল, মাথা ঘুরিয়া মেঝের উপর পড়িয়া যাইবে। অতিকষ্টে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। প্রমোদের কথার মধ্যে কোনই অস্পষ্টতা নাই। কেন তাহার এতগুলি চিঠির কোনওটিরই জবাব পাওয়া যায় নাই, কেন হরিপদ এত চেষ্টা

করিয়াও তাহার সহিত দেখা করিতে পারে নাই, তাহার তাৎপর্য্য এতদিন উমা নিজের সন্দিগ্ধ শঙ্কিত মনের কাছে অস্বীকার করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সন্দেহের আর অবকাশ নাই। কোনও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত লোক যে এমন নৃশংস প্রতারণা করিতে পারে, উমার মধ্যবিত্ত সমাজের অভিজ্ঞতায় তাহা অবিশ্বাস্য ছিল। প্রমোদকে তাহার ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইয়াছিল; আজ প্রমোদের মুখের উপর হইতে সযত্নরচিত একটা মুখোস যেন চকিতে খসিয়া পড়িল।

সহসা উমা প্রমোদের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে আকুতিপূর্ণ আবেদন করিয়া কহিল, 'ওগো, আমাকে রক্ষা করো। আমাকে বাঁচাও। আমার যে আর উপায় নেই। আমাকে যে বাড়ির বার করে' দেবে। লোকের কাছে যে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। বরঞ্চ মেরে ফেল, আমাকে তুমি মেরে ফেল। এর চেয়ে যে আমার মরণ ভালো। দোহাই তোমার, এমন করে' আমার সর্ব্বনাশ করো না···'

'উঠে বসো। তাজি এসেছে।' প্রমোদ কহিলেন। 'না, আর কিছু চাইনে, তাজি-সাহেব। ভুলে বেল্ টিপেছিলাম।···এই, শোন্। মেমসাহেব এখনই যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে নিচে গিয়ে গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিবি, বুঝেছিস্? এবার বাইরে যা। ইনি এক্ষুনি আসছেন···'

তাজি নিঃশব্দেই প্রস্থান করিল।

'এই নির্জ্জন দুপুরে তোমার মত যুবতী নারী এক পরপুরুষের ঘরে বসে থাকবে, এটা তোমার সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে।' প্রমোদ কহিলেন। 'এবার বরঞ্চ উঠে পড়। বাইরে তাজি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে আর দাঁড় করিয়ে রেখো না। অবশ্য আমারও একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে; এবার সেদিকে নজর না দিলে চলবে না। তোমার যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র···'

উমা স্তম্ভিতের মতো প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই উঠিয়া পড়িল। কহিল, 'সবই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বড় দেরিতে বুঝেছি। মন্টিদি আমাকে আগেই আভাস দিয়েছিলেন, তাঁর কথা তখন গায়ে মাখিনি। তা হলে এ দুর্দ্দশায় আমাকে পড়তে হতো না...'

'মন্টিদি আভাস দিয়েছিল, কেমন!' প্রমোদ বিরস-কণ্ঠে কহিলেন। 'তার ফলটা তিনি এখন হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। রাজপ্রাসাদ থেকে পদস্খলিত হয়ে অজ পাড়াগাঁয়ের পর্ণ-কুটিরে পুনর্মূষিক হয়েছেন। পুকুরপাড়ে নিত্য এঁটো-বাসন মাজচেন; ভাজদের মুখ-ঝাম্‌টা চিবোচ্চেন।...তবে, হ্যাঁ, যাবার আগে তোমার তিনি আর একটু উপকার করে' যেতে পারতেন। পেটের শত্রু কি করে' খালাস করতে হয়, এটা তিনি ভালো ভাবেই শিখে গেছেন। ঠিকানা দেব, ইচ্ছে করলে চিঠি লিখে জেনে নিতে পার।...এক মিনিট। একেবারে খালি হাতে বিদেয় করতে চাইনে। এই নাও। পাঁচ-শো টাকার এই চেক্‌টা তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছিলাম; না এলে পাঠিয়ে দিতাম।...এতেই খরচ কুলিয়ে যাওয়া উচিত।' এই বলিয়া চিঠির প্যাডের মধ্য হইতে একটা চেক্ বাহির করিয়া প্রমোদ তাহা উমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

উমা মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চেক্‌খানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সহসা সচেতন হইয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া কুটি কুটি করিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া টুক্‌রাগুলি সক্রোধে সে প্রমোদের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিল এবং ঝড়ের মতো ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

প্রমোদের মুখে কোনও ভাবব্যতিক্রমই হইল না। আবার সে চোখের সামনে বাড়ির নক্সা তুলিয়া লইল। এ সমস্তই মামুলি ব্যাপার! ইহাতে উত্তেজিত হইবার কিছু নাই।

ঝোঁক

তখনও ভোর হয় নাই। এইমাত্র প্রথম ট্রাম চলার শব্দ শোনা গেছে। চারিদিকে এখনও শেষরাত্রের ফিকা অন্ধকার। এমন সময় সুষমা আধো-ঘুম হইতে চম্‌কাইয়া জাগিল। মায়ের ঘর হইতে একটা হাউ-মাউ কানে আসিল; কাশীপতি চেঁচাইতেছেন, গর্জ্জন করিতেছেন, হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। বিরজাসুন্দরী চাপা গলায় যতই বলিতেছেন, 'চুপ, চুপ, চেঁচিও না। সবাই শুনে ফেলবে, জানাজানি হয়ে যাবে!' ততই ক্রুদ্ধ কাশীপতি সকল বিবেচনা ও দূরদর্শিতা বিসর্জ্জন দিয়া শেষরাত্রের নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

সুষমা স্পষ্টই বাবার কথাগুলি শুনিতে পাইল: 'খুন করে' ফেলব! খুন করে ফেলব হারামজাদিকে! গলা টিপে মেরে ফেলব; লাথি মেরে বাড়ির বার ক'রে দেব। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি...'

সভয়ে সুষমা দ্রুত উমার বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, বিছানার উপর গায়ের চাদরটা স্ফীতিহীন ভাবে লুটাইয়া আছে। সুষমা অবাক হইয়া বিছানা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। কাছে গিয়া হাত দিয়া উমার বিছানা স্পর্শ করিল। তাহার অনুমান মিথ্যা নয়। উমা তাহার আগেই ও-ঘরের গর্জ্জন শুনিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ভালোই করিয়াছে। সুষমা তাহার গন্তব্যস্থল লইয়া উদ্বিগ্ন হইল না; আশু বিপদের মুখ হইতে সে যে সময়মত সরিয়া গেছে, ইহাতে নিতান্ত আশ্বস্ত বোধ করিল। বেচারি উমা! উহার অবিমৃষ্যকারিতা ও অসংযমের জন্য যতটা রাগ হয়, সহানুভূতি হয় তার চেয়ে বেশি।

সে প্রতারকের পাল্লায় পড়িয়াছিল, এটা তাহার একলার অপরাধ নয় ; এই অপরাধ সারা পরিবারের।

সুষমা কান পাতিয়া শুনিল। কাশীপতিকে আটকাইয়া রাখা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। চেয়ার, তেপায়া, বাক্স-তোরঙ্গের সঙ্গে সংঘাতের শব্দ হইতে সহজেই একটা ধস্তাধস্তি আন্দাজ করা গেল। কিন্তু শীঘ্রই আন্দাজের অবকাশ না রাখিয়া ও-ঘরের দরজার হুড়কা সশব্দে খুলিয়া গেল। কাশীপতি ক্রুদ্ধ গালাগালি করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইলেন।

'চুপ করো, চুপ করো। ভেবে ধীরে-সুস্থে যা করবার ক'রো। এমন করো না ; সর্ব্বনাশের ওপর সর্ব্বনাশ করে' বসো না।' স্পষ্ট টের পাওয়া গেল, কাশীপতিকে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া বিরজাসুন্দরী তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছেন।

'চুপ রও। কারুর কথা আমি শুনব না। আমি খুন করে' ছাড়ব।'

সুষমার কি হইল, সে ছুটিয়া গিয়া নিজেদের ঘরের দরজার খোলা হুড়কাটা তাড়াতাড়ি আঁটিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে উমা সেটি খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

'খোল্, দরজা খোল। সুষি, দরজা খুলে দে।' কাশীপতির অপ্রকৃতিস্থ গর্জ্জনের সঙ্গে দরজার উপর দমাদম্ ঘুষি পড়িতে লাগিল। 'কোথায় সেই হারামজাদি ! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়লে। সুষি ! খবরদার, বাঁচাতে চেষ্টা করো না বলে দিচ্ছি। লাথি মেরে আমি দোর ভেঙ্গে ফেলব···' ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুষির পরিবর্ত্তে দরজার উপর সজোর লাথি-বর্ষণ শুরু হইল।

সুষমা বাবার রাগকে কখনও ভয় পায় না। সে জানে, কাশীপতির রাগ ছেলেমানুষের রাগের মতন। ক্ষণকালের জন্য একেবারে জ্বলিয়া

উঠিয়া আবার চুপ্‌চাপ্‌ হইয়া যায়। উহার মধ্যে গর্জ্জন আছে, কিন্তু আঘাত নাই। আজ কিন্তু সহসা তার বড়ো ভয় করিতে লাগিল। আচম্‌কা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া এখনও তার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছে, হাত-পা কাঁপিতেছে।

ইতিমধ্যে দরজার উপর নিরবচ্ছিন্ন লাথি পড়িতে লাগিল—দুম্‌, দুম্‌, ধপ্‌।

সুষমা তাহার ভীতি-ক্ষীণ কণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, 'উমি ভেতরে নেই, বাবা।'

'নেই! বটে! হারামজাদা মেয়ে, মিথ্যে কথা বলছ। বাঁচাতে চাচ্ছ? খোল, খোল্‌ বলছি। নইলে দরজা ভেঙ্গে আমি ভেতরে ঢুকব…'

দরজা ভাঙুক আর না ভাঙুক, এইরূপ বেপরোয়া লাথি চালাইতে থাকিলে বৃদ্ধের পা ভাঙিয়া যাইবে। সুষমা শঙ্কিত হইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

আস্ত একটা পাগলের মতো কাশীপতি সগর্জ্জনে ভিতরে ছুটিয়া আসিলেন। ঘোলাটে চোখে একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া তিনি উমার বিছানার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন।

'কুলের কলঙ্ক! কোথায় গেল হারামজাদি!' নখ দিয়া উমার বিছানায় ছড়ানো গায়ের চাদরটা হিংস্র ভাবে আঁচ্‌ড়াইয়া তিনি একদিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। তারপর সহসা সুষমার দিকে আরক্ত চোখে তাকাইয়া সগর্জ্জনে প্রশ্ন করিলেন, 'কোথায় সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিস্‌? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস? শীগ্‌গির বল। যদি ভাল চাস্‌, শীগগির বল। নইলে আজ…'

'আমি জানিনে। আমি কিছুই জানি নে।' সুষমা কহিল।

'আলবৎ জানিস্‌। মিছে কথা বলছিস।'

'সত্যি বলছি, আমি কিছু জানিনে। কখন সে বেরিয়ে গেছে, আমি কিছুই টের পাইনি, বাবা…'

'মিথ্যেবাদী মেয়ে! হারামজাদা মেয়ে! যে আমার কুলে কালি দিয়ে গেছে, তাকেই ঢাকতে চাইছ! বল্ বলছি, বল্, নইলে তোরই একদিন আর আমার একদিন।' বলিয়া উমার নাগাল না-পাওয়া ক্রুদ্ধ হতাশায় কাশীপতি ছুটিয়া গিয়া সুষমার চুলের মুঠি আঁক্‌ড়াইয়া ধরিলেন। এই মারেন তো সেই মারেন। ক্ষিপ্তের কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 'বল্, এখনও বল। যদি ভালো চাস্, এই মুহূর্ত্তে বল…'

ইতিমধ্যে বিরজাসুন্দরীর চিৎকার শুনিয়া তারাপদ ছুটিয়া আসিয়াছে। কাশীপতির কাছে পৌঁছিয়া সে সতিরস্কারে কহিল, 'এ কি করছেন, ছেড়ে দিন্। এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না?…'

'এমন সব মেয়ের গায়ে হাত আমার অনেক আগেই তোলা উচিত ছিল।' কাশীপতি সুষমাকে ছাড়িয়া দিয়া আহত কুকুরের মতো দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইলেন। 'যদি তুলতুম, তবে আজ আর আমাকে এমন দুর্গতিতে পড়তে হ'তো না! এমন করে' সকল মান-সম্ভ্রম নর্দ্দমায় গড়াতো না।…শুনেছ, শুনেছ তোমার ছোট বোনের কীর্ত্তিকথা? সর্ব্বনাশটি ক'রে বসে আছে। সারা পরিবারের মুখে কালি লেপে…'

'তা যদি হয়ে থাকে,' তারাপদ গম্ভীরভাবে কহিল, 'তবে আপনিই তো তার জন্য সব চেয়ে বেশি দায়ি, আপনিই তো…'

'আমি!' কাশীপতি উত্তেজনার শিখর হইতে কয়েক সিঁড়ি নিচে হড়্‌কাইয়া আসিয়া কহিলেন, 'আমি দায়ি!…'

'হ্যাঁ, আপনি। আর কেউ নয়!' তারাপদ ঘাড় বাঁকা করিয়া কহিল। 'টাকার লোভে, আভিজাত্যের লোভে আপনি অন্ধ

হয়েছিলেন। অন্ধ হয়েছিলেন বলেই কিছু দেখেও দেখেন নি। পরকে শোষণ করা, পরকে মেরে সুবিধে আদায় করাই ধনিকদের রীতি, এটা জেনেও নিজের কাছে স্বীকার করতে চাননি। নীতি, সততা, ন্যায়বোধ যে তাদের জন্য নয়, এতটা বয়সে আপনার তা বেশ বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু বংশগর্ব্বে আপনি মেতে আছেন। কি করে বংশের গর্ব্ব অটুট রাখা যায়? টাকা ছাড়া এ যুগে বংশ-মর্য্যাদা টেকে না, এ তো প্রত্যহই চোখের সামনে দেখছেন। তাই এই দুয়ের একটা গোঁজামিল দিয়ে নিজের অহমিকাটা বজায় রাখবার জন্য বড়মানুষের বাড়ি মেয়ে পাঠাতে শুরু করলেন…'

'করলাম!' কাশীপতি চিঁচিঁ করিয়া কহিলেন। 'আমি কি এর কিছুই জানি? হরিপদই তাকে নিয়ে এল। শুনলুম, সে হরিপদর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সব জেনেশুনে সে যখন সেখানে নিজের বোনকে নিয়ে যেতে পারলে, তখন আমার আপত্তির…কিন্তু কই, কই সেই হারামজাদা গেঁজেলটা? আজ ওরই একদিন, আর আমারই একদিন! কেন সে হারামজাদাকে আবার বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম! সর্ব্বনাশ করে ছাড়লে…' বলিয়া কাশীপতি ছুটিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

'হরিপদ! যেন সে এখনও বাড়ি বসে আছে!' পিতার উদ্দেশে শাণিত ব্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়া তারাপদ কহিল। 'তাকে আপনি খুবই চেনেন, কিন্তু টাকা হাতে পেয়ে সব ভুলে গিয়েছিলেন। টাকার লোভে সবই ভুলতে পারেন, সবই করতে পারেন। তাতে বংশ-মর্য্যাদায় আটকায় না। অনায়াসে নিজের মেয়েকে একটা অচেনা লোকের বাড়িতে যাতায়াত করতে দিতে পারেন। যা হয়েছে তার জন্য দায়ি আপনি, আর দায়ি সেই পাষণ্ড, সেই সমাজের পরগাছা ধনী-নন্দন, যার টাকার চাকচিক্যে আপনারা সব কিছু ক্ষমা করতে পেরেছেন। যে

ক্যাপিটেলিস্ট জনসাধারণকে এক্স্প্লেয়েট করে, আর আপনার মতো যেসব ধনীর অনুগ্রহভোজী জীবেরা তাদের এক্স্প্লয়েটেশন সমর্থন করে...'

'তারাপদ!' কাশীপতি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন।

'আমি উচিত কথা বলতে ভয় পাইনে।' তারাপদ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল। 'আর এ-ও জানি, ধনীর অবিচারের প্রতিকার করবার সাহস আপনাদের নেই। এর বিহিত করতে হবে আমাকে।' বলিয়া আর একটিও কথাও না বলিয়া তারাপদ গট্গট্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটা। ট্রামের রাস্তার দিক হইতে হাঁটিয়া আসিয়া উমা সভয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে এবং আশেপাশে তাকাইয়া দেখিল, চেনাশোনা কেউ নজরে পড়িল না। কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া সে সখী রমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। পাছে বাড়ির লোকের কাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই জন্যই অফিসে যাওয়ার সময় পার করিয়া আসিয়াছে।

'কি রে, উমা। তোর খবর কি? অনেক দিন দেখা নেই কেন?'

'কাজ ছিল ভাই রমা।'

'তারপর আছিস কেমন?' রমা কহিল। 'এমন উস্কোখুস্কো কেন? মুখটা কালো দেখাচ্ছে কেন?'

'কেন, ভালোই তো আছি।' উমা ম্লান হাসিয়া কহিল। 'হ্যাঁ ভাই, তোর নরেন-দা আর আজকাল আসেন না?'

'আসবে না কেন? তুই তো আসিস না।' বলিয়া উমার দিকে রমা চোখ মেলিয়া চাহিল। দুষ্ট হাসিয়া কহিল, 'তার খোঁজ কেন, শুনি? বলি, সিনেমায় নামবি নাকি?'

'হ্যাঁ, নামব।' উমা সহজ কণ্ঠে কহিল। 'তার ঠিকানাটা দিতে পারিস ?'

'সত্যি বলছিস, নামবি !' রমা সবিস্ময়ে কহিল। 'তা হলে বাড়ির লোকেরা রাজি হয়েছে বল্ ? বেশ তো, নরেন-দা আসুন না। শুনে সে লুফে নেবে। দু'চারদিনের মধ্যে সে একদিন আসবেই ; ঠিকানা দিয়ে আর কি করবি ? নিজেই গিয়ে দেখা করবি নাকি রে ?'

'না, মানে, আমাদের চেনা একটি ছেলে আছে।' উমা ঠিকানা জানিতে চাওয়ার অশোভনতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া বানাইয়া বলিল, 'সে সিনেমায় নাম্‌তে চায়। তার ইচ্ছে নরেনবাবুর বাড়িতে একবারটি গিয়ে দেখা করে। যদি ঠিকানাটা দিতিস্ তবে খুব...'

'তা আর এমন একটা কি ব্যাপার।' রমা কহিল। 'সাদার্ণ-অ্যাভিনিউতে, রসা রোডের মোড়ের কাছাকাছিই বাড়িটা। দাঁড়া, নম্বরটা দেখে দিচ্ছি।' বলিয়া রমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

'নরেনবাবু আছেন ?'

'না, সাহেব তো বাড়ি নেই।'

'কখন ফিরবেন ?'

'একটা-দুটোয় খেতে আসেন।'

'আমি একটু বসব।'

'ভেতরে আসুন।' সামান্য দ্বিধা করিয়া বাঙালি ভৃত্যটি কহিল।

সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকে নরেনের বাড়ি বেড়াইতে আসে। আত্মীয়-স্বজনও অনেক আসে। কিন্তু এই মেয়েটিকে কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড্ কানাই আগে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। এইজন্যই ইহার অনুরোধে সামান্য বিব্রত

বোধ করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই দ্বিধাটুকু কাটাইয়া সে এই সুন্দরী অতিথিটিকে বসা-কাম্‌রায় লইয়া গেল।

একটা বড়ো সোফার এক প্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া উমা প্রশ্ন করিল, 'একটা-দুটোয় আসাব ঠিক আছে তো?'

'তা আসেন। একটা-দুটোর ভেতরই আসেন।' কানাই সবিনয়ে জানাইল।

'আমার খুব জরুরি দরকার। আমাকে দেখা করে যেতে হবে।'

'তা আপনি বসুন। বই-পত্তর আছে, পড়ুন। চা দেব কি?'

'না। দরকার নেই।'

নরেন বর্দ্ধনের বাড়ি ফিরিতে প্রায় তিনটা বাজিল। দোতলার বসিবার ঘর ও সিঁড়ির মুখের মাঝামাঝি ঘাঁটি স্থাপন করিয়া কানাই একই সময় প্রভুর প্রতীক্ষা ও অচেনার উপর নজর রাখিতেছিল, নরেনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'খেয়ে নিয়েছিস্ তো, কানাই?'

'আজ্ঞে না তো। আপনার জন্য অপিক্ষে···'

'আহাম্মক আর গাছে ফলে!' নরেন শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াইয়া কহিল। 'কতদিন তোকে বলব, বেশি দেরি দেখলেই বুঝবি আমি বাইরে খাব। আমাকে এক গেলাস খাবার জল দিয়ে তুই খেয়ে···'

'একজন ভদ্রমহিলা, মানে এক দিদিমণি,' কানাই সসম্ভ্রমে কহিল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বসে আছেন। তা প্রায় ঘণ্টা তিনেক হবে বসে আছেন। আমি বল্লাম···'

'তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন!' নরেন সবিস্ময়ে কহিল। 'চিনিস্?'

'আজ্ঞে না।' কানাই মাথা চুলকাইয়া কহিল, 'ঠিক মনে করতে পারছি নে…'

নরেন বিস্মিতমুখে দিক্‌-পরিবর্ত্তন করিয়া ড্রইং-রুমের দিকে পা চালাইল।

'আরে, এ কে !'

উমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। আচম্‌কা আহ্বানে সে সোফা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

'বসুন। বসুন। আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি হ'তে পারেন।' নরেন কাছে আসিয়া কহিল। 'অনেকক্ষণ ধরে' বসে আছেন শুনলাম। দাঁড়ান, আগে চায়ের কথা বলে আসি…'

'ওসব থাক। আপনার কাছে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।' উমা গলা সাফ্‌ করিয়া কহিল।

'দরকার তো আছেই, তা বলে চা তো কোনও অপরাধ করেনি, উমা দেবী !' নরেন সকৌতুকে কহিল। 'এমন অভাবনীয় অতিথি আমার বাড়িতে বড কথনও আসে না। যদি সৌভাগ্যক্রমে এসেছে, আতিথ্যের কোনও ত্রুটি ঘটতে দিতে পারিনে। এক মিনিট বসুন।' বলিয়া নরেন পরিতৃপ্ত মুখে বাহির হইয়া গেল।

শীঘ্রই কর্ত্তব্যসমাধা করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। উমার সোফার নিকটে গদি-আঁটা মোড়া টানিয়া কহিল, 'এবার বলুন আমি কি করতে পারি ; হুকুম করুন। রমাকে বললে সে-ই আমাকে খবর দিতে পারত। আপনাকে আর কষ্ট করতে হ'তো না। কিন্তু এ বড়ো ভালো হয়েছে। এমন সৌভাগ্য আমার বড়ো একটা হয় না…'

উমা ক্ষণকাল দ্বিধা করিল। তারপর নিম্নস্বরে কিছুটা কাঁপা-গলায় কহিল, 'আপনি একবার বলেছিলেন, যদি আমি সিনেমায় নামতে চাই, তবে আপনি তার ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন…'

'পারি বৈ কি। অবশ্যই পারি।' নরেন কহিল। 'আপনার মতো সব দিক থেকেই উপযুক্ত অভিনেত্রী পেলে সিনেমাওয়ালারা লুফে নেবে। আমার বিশেষ কিছু করতেই হবে না—ভালোই হলো, আমি নিজেও একজন 'হেরোয়িন্' খুঁজছি। খেঁদি, পেঁচিকে দিয়ে ও 'রোল্' করানো অসম্ভব। আর বাজার-চল্‌তি সিকি-দোয়ানিদের মামুলি মুখ নতুন করে' দর্শকদের দেখাতে আমার ঘেন্না হয়। বেশ হয়েছে! আসুন, এই ছবিতেই আপনাকে নানিয়ে দিই। ভূমিকাটা আপনার দিব্যি মানানসই হবে…'

নরেন প্রায় মুগ্ধ চোখে উমার দিকে তাকাইয়া রহিল। বড় চমৎকার লাগে তার এই মেয়েটিকে। এর চেয়ে উপযুক্ত মিষ্টি স্বভাবের তরুণী নায়িকা সে কল্পনা করিতে পারে না। ইহাকে শুধু চিত্রের নয়, নিজের নায়িকা করিতেই ইচ্ছা হয়!

'না দেখুন, ঠিক এখুনি নামা চলবে না।' উমা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে কহিল।

'কেন? বাড়ির মত পান নি?' নরেন হতাশ হইয়া কহিল।

'ঠিক তা নয়। মানে...'

'তবে আর দ্বিধা করবেন না।' নরেন আবার উৎসাহিত হইয়া কহিল। 'প্রথমেই নায়িকার 'রোল্'-এ নামবার সুযোগ সব সময়ে পাওয়া যায় না। নানা ফ্যাঁকড়া আছে, দাবিদাওয়া আছে…এটা এক রকম আমারই হাতে আছে বলে সহজেই আপনাকে নিয়ে নিতে পারব বলে মনে হয়। নামতে হলে এখনই…'

'মাস পাঁচ-ছয় পরে হলে চলে না?'

'ছ'মাস! অসম্ভব। যখন নামা স্থির করেছেন, তখন মিছিমিছি দেরি করবেন কেন?'

'এখন নামায় বাধা আছে।' উমা দুই চোখ মেঝের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল।

'কি বাধা ?' নরেন তবু অধৈর্য্য প্রশ্ন করিল।

'তাতে আপনাদেরই অসুবিধেয় পড়তে হবে।' উমা তাহার মধ্যবিত্তসুলভ সততাসহকারে কহিল। 'তা উচিত হবে না। কিন্তু ছ'মাস পরে আমি নিশ্চয়ই নামব। আমি কথা দিচ্ছি। যদি ভরসা দেন, বাড়ি ফিরে যাই। যদি সাহায্য না করেন, তবে আর আমার উপায় নেই।' বলিতে বলিতে উমার কণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

'ব্যাপার কি ?' পলকে নরেন সবিস্ময় সন্দিহান দৃষ্টি উমার দিকে ন্যস্ত করিল।

'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না।' উমা ভারি গলায় কহিল। 'কিন্তু বলুন, সাহায্য করবেন। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না...'

'আমার যথাসাধ্য নিশ্চয়ই করব।' নরেন গম্ভীরভাবে কহিল। 'কিন্তু এটা হাতের মধ্যে ছিল। হাতের পাখিতে আর বনের পাখিতে তফাৎ অনেক, জানেন তো ?...উঠছেন কেন, চা না খেয়ে গেলে আমি খুবই দুঃখিত হবো। কাউকে অসন্তুষ্ট করে কি কখনও তার সাহায্য পাওয়া যায় !' বলিয়া উমার মুখের কারুণ্য দূর করিবার জন্য নরেন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

উমা যখন নরেনের গাড়ি করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া নরেনের ফ্ল্যাট হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল, তখন বিকেল হইয়াছে। জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা পাকা করা সম্ভব হইল না ; এই মুহূর্ত্তেই কাজ নেওয়া সম্ভব নয়। পেটেরটা আগে না

পড়িলে কিছুই করা চলিবে না। প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া কি তার কাজ নেওয়া উচিত ? ছবি যে অর্দ্ধেক হইবার আগেই সে অচল হইয়া পড়িবে ! নরেনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহাকেই কি সে প্রতারণা করিতে পারে ? এমন অকৃতজ্ঞ সে হইতে পারিবে না। ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে কি না, সে সম্বন্ধে নরেন কোনও ভরসা দিতে পারে নাই, তবে সে তার যথাসাধ্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ইহা লইয়াই এখন সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

উমা ট্রাম রাস্তার কাছে আসিয়া থামিল। মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এখন কোথায় যাওয়া যায় ? সারাদিন তার খাওয়া হয় নাই। নরেনের বাড়িতে চা-স্যাণ্ডউইচ না খাইলে সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত কি না সন্দেহ।

হরিপদর গোপন ঠিকানা উমা জানে, তার কাছে যাওয়া চলে। কিন্তু উমা তাহাতে গভীর বিতৃষ্ণা বোধ করিল। হরিপদ যে লোক খারাপ, ঠিক তা নয় ; বোনকে সে ফেলিয়া দিবে না ইহাও ঠিক। কিন্তু উমার কেবলই মনে হইল, তাহার এই বিপদের জন্য হরিপদই বার আনা দায়ি। সে জানিয়া শুনিয়াই প্রমোদকে সাহায্য করিয়াছে কি না, তাই বা কে বলিবে। তার কাছে গেলে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন্ পরামর্শ শুনিতে হইবে, তাহা উমা জানে। ভয়ে ও বিতৃষ্ণায় তার সারাটা গা শিহরিয়া উঠিল।

সান্ধ্যসংবাদপত্রের ফেরিওয়ালারা কতক্ষণ ধরিয়াই কোনও এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছিল। উমার চোখের সামনেই বহুলোক কাগজ কিনিয়া 'ব্যানার হেডলাইন্' গিলিতে লাগিল। কিন্তু উমা এমন চাঞ্চল্যকর খবরের সন্ধান পাইয়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না।

যদি বাড়ি ফিরি কি হইবে?—উমা ভাবিতে লাগিল। একেবারে তো ফেলিয়া দিতে পারিবে না? মারিবে? মারুক। মার তার প্রাপ্য হইয়াছে। লাঞ্ছনা তার প্রাপ্য হইয়াছে। তবু তো ইহা আপনার লোকের হাত হইতে পাওয়া নিগ্রহ। তা বলিয়া বাড়ি ছাড়িয়া যাইবে কোথায়? আর আশ্রয় কই? দিদির কাছে সহানুভূতি পাওয়া যায়, উপদেশ পাওয়া যায়। মার কাছেও হয়তো একটু প্রশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে। বাবা অবশ্য লাফালাফি করিবেন; কিন্তু বেশিক্ষণ তিনি ভয়ঙ্কর হইয়া থাকিতে পারেন না। এক ছোড়দা। সে ভারি রাগী মানুষ। উমার অপরাধ সে সহজে ক্ষমা করিতে পারিবে না। কিন্তু তাকেই বা ভয় কি? সব-কিছু সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে বাড়ি ফিরিবে। এখন নিজেকে বাঁচানো, পেটের সন্তানটাকে বাঁচানোই তার কাছে সব চেয়ে বড় কথা। তার পর নিজের পথ সে নিজেই দেখিয়া লইবে। কিন্তু আজ আর পারিতেছে না, সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ওলোট-পালোট হইয়া যাইতেছে। এমন দিনে বাড়ি না ফিরিয়া আর যাইবে কোথায়? আর কাহার উপর নির্ভর করিতে পারে?…

'নিন না একটা কাগজ। দু'পয়সা মাত্র। সারাদিন কিছু খাইনি দিদিমণি।'

একটা বাচ্চা কাগজওয়ালা উমার হাতে একটা বাংলা সান্ধ্য সংবাদপত্র গুঁজিয়া দিল। বিব্রত হইয়া উমা ব্যাগ খুলিল এবং একটা আনি বাহির করিয়া দাম মিটাইয়া অলসভাবে কাগজের পাতা-জোড়া হেড-লাইনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মুহূর্ত্তে উমার দুই চোখ বড় হইয়া উঠিল। হেডলাইনে প্রকাণ্ড করিয়া লেখা রহিয়াছে: 'কমিউনিস্টের বিভৎস কাণ্ড! বিখ্যাত জমিদার ও সুপরিচিত নাগরিক প্রমোদ চৌধুরি

সাংঘাতিকভাবে আহত!! লোহার ডাণ্ডাসহ আততায়ী গ্রেপ্তার!!!'

উমার মনে হইল সে একদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়া যাইবে। চোখের এবং মনের সকল শক্তি সংহত করিয়া সে পড়িয়া গেল: 'বেলা প্রায় বারটার সময় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও সুপরিচিত নাগরিক প্রমোদ চৌধুরি যখন তাঁহার আলিপুর রোডস্থ বাস-ভবনের বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন, তখন ২৮।২৯ বৎসর বয়স্ক একটি বাঙালি যুবক তথায় প্রবেশ করিয়া লোহার ডাণ্ডা দিয়া চৌধুরি-মহাশয়ের কাঁধে ও ঘাড়ে উপর্য্যুপরি কয়েকবার আঘাত করে। প্রমোদবাবু তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যান; চামড়া কাটিয়া ফিনিক্ দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। প্রমোদবাবুর চিৎকারে বাড়ির দারোয়ান ও চাকর-বাকরেরা ছুটিয়া আসিয়া আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে এবং পুলিসে সোপর্দ্দ করে।...পুলিসের খাস্-দপ্তরে খোঁজ নিয়া জানা গেল, আততায়ী একজন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির কমিউনিস্ট। সে যে মোটর-গ্যারাজে কাজ করে, প্রমোদবাবু তাহার অন্যতম ডিরেক্টর। ইহাই যুবকের আক্রোশের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কোম্পানীর সঙ্গে কমিউনিস্ট-পরিচালিত য়ুনিয়নের কিছু দিন যাবৎ ঠোকাঠুকি চলিতেছিল। আর জানা গেল, আততায়ী যুবকের নাম তারাপদ দত্ত...'

'ট্যাক্সি!' বলিয়া পাশের চলন্ত ট্যাক্সিটাকে থামাইয়া উমা কোনও মতে আসনের উপর গড়াইয়া পড়িল। আর একটু হইলেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া যাইত।

'কাঁহা যানা পড়ে গা?' মিটার-ফ্ল্যাগ্ নামাইয়া শিখ ট্যাক্সি-চালক কহিল।

'সিধা!' উমা যেন স্বপ্নের মধ্য হইতে কহিল।

সমস্ত পৃথিবীটাই ওলোট-পালোট্ হইয়া গেল। ছোড়-দা! প্রমোদ চৌধুরি! দুর্বৃত্তের শাস্তি! পুলিশ! কমিউনিস্ট! রক্ত! লোহার ডাণ্ডা! বিচার! জেল! সব তালগোল পাকাইয়া গেল। এইবার আর কোনও কিছুই চাপা থাকিবে না। সকল গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কাগজে কাগজে কলঙ্কের বিস্তৃত কাহিনী বাহির হইবে। জনসাধারণ রসাল আলোচনা চালাইবে। কোর্টে টানাটানি হইবে; জেরায় জেরায় সকল কথা ফাঁস্ হইয়া যাইবে। গুপ্তিপাড়ার দত্ত-বংশের মুখে যে কালি লাগিয়াছে, চুপে চুপে তাহা মুছিয়া ফেলিবার আর কোনও উপায় থাকিবে না। তারাপদর জেল হইবে। তারাপদকে জেলে পাঠাইবার জন্য যে দায়ি, কাশীপতি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। সকল সর্ব্বনাশের জন্য যে দায়ি, তাহার গৃহে স্থান নাই।...

সন্ধ্যার পর যে দু-পাঁচজন ফ্যাশন-বিলাসী স্ত্রী-পুরুষ আউট্রাম ঘাটের পন্টুনের দোতলায় অবস্থিত রেস্তরাঁটিতে বসিয়া নৈশ গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণের সঙ্গে চা, লেমনেড আইসক্রিম প্রভৃতি পান করিতেছিল, তাহারা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই! মেয়েটাকে তাহাদের কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, তাহাদেরই সতীর্থ; গঙ্গায় ভাসমান রেস্তরাঁটিতে সন্ধ্যা কাটাইতে আসিয়াছে। সে যে এদিকে না আসিয়া বিপরীত দিকের আধা-অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

সহসা ইহাদের একজন চিৎকার করিয়া উঠিল, 'এ কি হচ্ছে!' একটি মহিলা ভীত কণ্ঠে কহিল; 'ও মাগো!' তখন আরও কয়েকজন হত-চকিত ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল: 'ধর্ ধর্ ধর্।'

কিন্তু কেহ কাছে উপস্থিত হইবার আগেই মেয়েটি দোতলার রেলিংয়ের উপর হইতে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া অন্ধকার গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্ত্ত কোলাহলে আউট্রাম ঘাটের শান্ত জেটি পূর্ণ হইল।

সতেরো

কাশীপতির মনের অবস্থা অফিসে বসিয়া কাজ করিবার মতো নহে। বেলা আড়াইটা আন্দাজ তিনি অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি লইয়া অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সরাসরি বাড়ি ফিরিলেন না। নাম-শোনা বা সাইন্-বোর্ড দেখা দু' চারটা নারী-কল্যাণ আশ্রমে গিয়া সেখানকার প্রসূতি-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইলেন; কিন্তু ধরা-ছোঁয়া দিলেন না। তাঁর বাড়ি পৌছিতে প্রায় সাড়ে চারটা হইল।

বারান্দায় একটা মোড়ার উপর দুই হাতে দুই গাল চাপিয়া সুষমা নীরবে বসিয়াছিল, বাবাকে অসময়ে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বাড়ি এসেচে?'

'না।'

'লক্ষ্মীছাড়ীটাকে নিয়ে যে আমি কি করি, ভেবে পাইনে। তাও যদি ফিরে আসত, শলা-পরামর্শ করে' যা হোক্ কিছু···তোর মা কোথায়?···'

'মা এখনও জলটুকুও ছোঁন নি। তেমনি মুখ গুঁজে পড়ে' আছেন!' সুষমা কহিল।

'ছোঁন্‌নি! মুখ গুঁজে পড়ে আছেন! এদের জ্বালায় শেষ হলাম।' কাশীপতি ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। 'যেন সবই আমার দোষ! আমি একা, ক'দিক সাম্‌লাই? সর্ব্বপ্রকারে আমাকে পাগল করে' তোলবার ব্যবস্থা হচ্চে! ইচ্ছে হচ্চে, যে দিকে দু' চোখ যায়, দুত্তোর বলে বেরিয়ে পড়ি। লক্ষ্মীছাড়ী মেয়েটার কাণ্ড দেখ। যা করেছিস,

তা তো করেছিস্। তা বলে কি একেবারে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে যেতে হবে! আমি কি মানুষ, না কি!...'

গজর্ গজর্ করিতে করিতে কাশীপতি শয়ন-ঘরের দিকে আগাইয়া গেলেন।

'একটু চা কর্ দেখি, সুষি।' দরজার মুখে সহসা থামিয়া পড়িয়া কাশীপতি কহিলেন, 'তারপর একবার খুঁজতে বেরুই। যথেষ্ট কেলেঙ্কারি হয়েছে, আরও জানাজানি হবার আগে একটা কিছু বিহিত করতে হবে। সব হাঙ্গামা পোহাবার বেলা এই বুড়ো ব্যাটা; তখন আর কাউকে দেখা যাবে না...'

আজ প্রত্যুষে তারপদর কাছ হইতে তিনি যে তিরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। সারা দিন নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া, নানাভাবে তিনি তারাপদর অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সম্পূর্ণ সক্ষম হন নাই। কথাগুলির অন্তর্নিহিত সত্য এখনও তাঁহাকে খোঁচা মারিতেছে। সত্যই কি তিনি উমার এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ি? অসম্ভব নয়। সম্প্রতি তাঁহার ধনী-প্রীতি বিশেষ রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। সহকর্ম্মী সতীশ লাহিড়ীর চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্য্যই প্রথমে এই ছোঁয়াচ ধরাইয়া দেয়। ধনী জামাতা পাইবার জন্য তিনি বড় ব্যগ্র হইয়া ওঠেন। ইহার উপর সদ্য প্রলোভন হিসাবে ছিল প্রমোদ চৌধুরির কাছ হইতে ব্যবসায়ের মূলধন জোগাড়ের আশা। লোভের পাকে পড়িয়াই হয়তো তিনি ঔচিত্য-অনৌচিত্যের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। উমার চলা-ফেরা সম্বন্ধে তাঁহার শাসন আশ্চর্য্য রকম বেশি শিথিল হইয়া উঠিয়াছিল।

শত হোক্, উমা তাঁর ছোট মেয়ে; আদরের মেয়ে। অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কি একেবারে বাড়ি-ছাড়া করিতে পারেন? বংশে

যে কালি লাগিয়াছে নির্দ্দয়তা করিলেই কি তাহা দূর হইবে? বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিলে উমা যাইবে কোথায়?

বিরজাসুন্দরী গম্ভীরমুখে বিছানার উপর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার চোখে জল ছিল না; কিন্তু কান্নায় চোখ লাল এবং মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে।

'উপোস দিয়ে কার কি লাভটা হচ্চে শুনি?' কাশীপতি আক্রমণাত্মক কণ্ঠে কহিলেন। 'মেয়েটাকে বাড়ি-ছাড়া করতে আমারই কি খুব আনন্দ হচ্চে নাকি? এখন কি করা না করা ভেবে দেখা দরকার; সেখেনে মুখ-ভার করে' বসে থাকলে বড় উপকারটা হবে...'

বিরজাসুন্দরী ইহার কোনও জবাব দিলেন না; তাঁহার শুষ্ক চোখ আবার অশ্রুতে পূর্ণ হইল।

'তা বেশ, না হয় আমি বেরুচ্ছি।' কাশীপতি কহিলেন। 'খুঁজে পাই তো নিয়ে আসব।...অফিস থেকে ফেরবার মুখে গুচ্চের নারী-কল্যাণ আশ্রমে খোঁজ নিয়ে এসেছি...' বলিয়া কাশীপতি গায়ের কোট খুলিয়া আলনার দিকে গেলেন।

'বাবা?'

'কি খবর?' কাশীপতি পিছন ফিরিয়া সুষমাকে দরজার মুখের কাছে দেখিতে পাইলেন। তাহার উত্তেজিত মুখ ও বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখিয়া কাশীপতি অবাক হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তে এমন কি ঘটিল যাহাতে সুষমার মুখের এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে!

'বাবা, এই দেখ!' বলিয়া সুষমা একটা খবরের কাগজ কাশী-পতির হাতে আগাইয়া দিল। কাশীপতি কাগজে চোখ বুলাইলেন; ক্ষণকাল তাঁহার মুখে কোনও ভাবোদয়ই হইল না। তারপর 'হায় ভগবান!' বলিয়া তিনি মেঝেতেই বসিয়া পড়িলেন।

'কি হলো, কি হলো!' বলিতে বলিতে এইবার বিরজাসুন্দরী বিছানা ত্যাগ করিয়া কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

ইহার পর আধঘণ্টা কাটিয়া গেছে। কাশীপতি বাড়ির ছোট উঠানটায় খাঁচায় পোরা বেজির মত ছটফট করিয়া পায়চারি করিতেছেন; বার বার তিনি নিজের চুল টানিতেছেন। যেন কোনও পথ না দেখিয়া, কোনও কিছু করিতে না পারিয়া নিজের মাথাটাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন।

'বাবা, ঘরে এসে বসো।' সুষমা কাছে গিয়া কহিল।

'যা যা, নিজের কাজে যা। ভাবতে দে, আমাকে ভাবতে দে...' পায়চারি না থামাইয়া কাশীপতি বিভ্রান্তের মতো কহিলেন। 'কি করা যায়? বলতে পারিস, এখন কি করা যায়? এবার তো সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে! কাগজে বেরুবে, কাছারিতে জেরা হবে! গুপ্তিপাড়ার দত্তবংশে যে কালির ছাপ লাগবে, সে কালি আর উঠবে না! আমি কি করব? কি করব বল্? জামিনে খালাস করে আনব? তাদের জেরার কি জবাব দেব? এক যদি সত্যি কথা বলি, নিজ পরিবারের কলঙ্ক নিজ মুখে প্রকাশ করে' দিই। তা আমি পারব না! তা আমি কিছুতেই পারব না। তা যে গোঁয়ার্ত্তুমি দেখিয়েছে, সেই করুক। নিজের মুখে সে-ই নিজের বোনের কীর্ত্তিকথা প্রকাশ করে' দিক্। আমি বাড়ি থেকে নড়ছি না, এক পাও নড়ছি না...'

'বাবা, ও-রকম ক'রো না। ঘরে এসো। আমরা যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি।...চা করেছি, বাবা। খাবে এসো।' বলিয়া সুষমা কাশীপতির হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া বারান্দার দিকে লইয়া চলিল।

রাত আটটা। তারাপদর ঘরে তারাপদর বিছানার উপর কবরের উপরকার ভূতের মতো কাশীপতি বসিয়া আছেন। সুষমা অপর তক্তপোষটির উপর চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। বাড়িতে রান্না-বান্না বন্ধ। বিরজাসুন্দরী শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। কাশী-পতির প্রতিই সুষমাকে বিশেষ নজর দিতে হইতেছে। তারাপদ তাঁর বড় প্রিয়। উহার সাহায্যার্থ কিছু করিবার জন্য কাশীপতি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, অথচ উমার ইতিহাস প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সাহস সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ আগে পাড়ার দু'চারজন খবর লইতে আসিয়াছিল, সুষমা অতি কষ্টে তাহাদের ফিরাইয়াছে। কাহারও প্রশ্ন সহ্য করিবার মতো কাশীপতির মানসিক অবস্থা নয়।

'ঐ হারামজাদা মেয়েটাই আমার সকল সর্ব্বনাশের কারণ!' সহসা কাশীপতি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন। 'নিজে ডুবলে, ভাইকে ডোবালে, সারা পরিবারকে ধনে-মানে নিকেশ করলে। কি শত্তুরই ঘরে এসেছিল! কি কুক্ষণেই…এমন মেয়েও কারুর ঘরে জন্মায়! যদি সামনে পেতাম, গলা টিপে মেরে ফেলতাম। নিজ হাতে ওর গলা টিপে…' বলিতে বলিতে গলা টেপার সমস্ত লক্ষণ তিনি মুখে, চোখে, মাংসপেশীতে ফুটাইয়া তুলিলেন।

'বাবা, উমি হয়তো আজ সারা দিনে কিছুই খায় নি।' সুষমা আর্দ্র কণ্ঠে কহিল।

'খাবে বৈকি। নিশ্চয়ই খাবে। বাজারে বিষ নেই? খেতে পারে না? এখন আমি কি করি? করি কি বল্? আমার একটা মেয়ে কুলটা, আমার একটা ছেলে গোঁয়ার, খুনে। আমি কোন্ দিক্ সামলাই? বল্ আমি কোন্ দিক…'

দরজার কাছে সহসা একটি মনুষ্যমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া কাশীপতি তাঁহার ক্রুদ্ধ বিলাপ সংক্ষিপ্ত করিলেন।

'ভেতরে আসব ?' মূর্ত্তিটি কহিল।

'কে ? প্রকাশ !' কাশীপতি চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিলেন। 'এসো, ভেতরে এসো। আমি যে মনে মনে তোমাকেই খুঁজছি। তোমার বন্ধুর খবর শুনেছ তো ?...'

'আজ্ঞে, আমি থানা থেকেই বরাবর আসছি।' প্রকাশ কাছে আসিয়া কহিল। 'জামিনের চেষ্টা করলুম, কিন্তু ছাড়াতে পারলুম না। যদি একবার আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, তবে আর একবার চেষ্টা করে দেখা...'

'না না। আমি পারব না। আমি যেতে পারব না।' সহসা কাশীপতি সাতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন। 'যা পার, তোমরা করো। তোমরা তার বন্ধু, তোমরা কর। আমি গিয়ে কি বলব ? জামিনের স্বপক্ষে কি বলব ?...'

'যা জানেন, সবই বলবেন।' প্রকাশ কহিল।

'তা সে নিজে বলুক। নিজের কথা নিজে বলুক। আমি বলতে যাব কেন ? আমি নিজের মুখে...'

'সে পুলিসের কাছে একটি কথা বলতেও রাজি নয়, এই তো হয়েছে মুস্কিল !' প্রকাশ কহিল।

'বলেনি ! একটি কথাও বলেনি !' কাশীপতি প্রায় উৎফুল্ল স্বরে কহিলেন। 'সে গুপ্তিপাড়ার দত্ত-বংশের ছেলে। সে কি বংশের মুখে কালি মাখাতে পারে !...বাবা প্রকাশ, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমার কাছে বলতে কিছু লজ্জা নেই, সে কথা বলবার মতো নয়। সে বড়ো লজ্জার কথা...'

'আমি সবই জানি।' প্রকাশ নিম্নস্বরে কহিল। 'পুলিসের

কাছে সে একটি কথাও বলবে না, কিন্তু চুপেচুপে সব কথাই সে আমাকে বলেছে।…আমার মনে হয়, সব কথা পুলিসকে জানালে তারাপদর মোটে শাস্তিই হবে না। আপনি নিজে গিয়ে একবার পুলিসকে সব কথা জানালে…'

'সে আমি পারব না!' কাশীপতি সহসা আবার কঠিন হইয়া কহিলেন। 'নিজ মুখে নিজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করতে পারব না। গুপ্তিপাড়ার দত্ত-বংশের…হ্যাঁ বাবা, পুলিশ কি কিছু সন্দেহ করছে? এ সম্বন্ধে কি কিছু…'

'ওরা অন্য সন্দেহ করছে,' প্রকাশ কহিল। 'তারাপদ আমাদের, কারখানার মজদুর-য়ুনিয়নের সেক্রেটারি, জানেন তো? পুলিস ভেবেছে, মজুরদের অসন্তোষের সঙ্গে এ-ঘটনার সম্পর্ক আছে। একেবারে ভুল দিকে যাচ্ছে। তবে মনে হয়, পুলিস কাল সকালের দিকে আপনার কাছে তদন্তে আসতে পারে।…'

'পুলিস! আমার কাছে! আমার কাছে কেন?' কাশীপতি বিপন্ন কণ্ঠে কহিলেন। 'কি মুস্কিল! দেখ তো একবার কাণ্ড! তা হলে কাল সকালে তুমি একবার এসো, বাবা প্রকাশ। তুমি ছাড়া আমাদের আর তো কেউ নেই।…'

'আসব বৈ কি। নিশ্চয়ই আসব। আপনি যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই আসব। এ তো আমার কর্ত্তব্য…'

পরদিন অতি প্রত্যুষেই প্রকাশ কর্ত্তব্যপালনে আসিল। সকালের খবরের কাগজটা হাতে পাওয়ার পর কর্ত্তব্যটা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আঠারো উনিশ বছরের এক তরুণীর গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যার একটা খবর বাহির হইয়াছে। পুলিস ইতিমধ্যেই মৃত দেহটা মর্গে পাঠাইয়া দিয়াছে। মৃতার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট

ঘটনা মিলাইয়া তরুণী কে, সে সম্বন্ধে প্রকাশের কোনই সন্দেহ থাকে নাই।

তবু সে প্রথমে ইহা উল্লেখ করিবে না স্থির করিয়াছিল। কিন্তু কাশীপতিবাবু ইতিমধ্যেই খবরটা পড়িয়াছেন; তারাপদর সংবাদের জন্য প্রায় সারারাত ধরিয়াই তিনি প্রভাতের সংবাদপত্রের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। কাশীপতির চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু মুখ দিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারিত হইতেছে, 'চুপ, চুপ! সবাই জেনে ফেলবে। চেপে যাও! আমরা এর কিছুই জানিনে। ও আমাদের কেউ নয়। কে জানে এই মেয়েটা কে, কে জানে সে কে?…'

বিরজাসুন্দরী এবার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'আমি যাব। আমিই যাব। আমি একবার গিয়ে দেখে আসব। কক্ষনো সে নয়। এমন কাজ সে কক্ষনো করতে পারে না, সে যে আমার ছোট্ট মেয়েটি গো…'

কাশীপতি ক্রন্দন-মিশ্রিত ধমকের সুরে কহিলেন, 'চুপ, চুপ, চুপ।'

প্রকাশ একাই মর্গে গেল। মৃতা সত্যই উমা কিনা তাহা জানিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু সে যে মৃতাকে চিনিত, মৃতার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে, তাহা প্রকাশ করা চলিবে না। কাশীপতির কড়া নিষেধ আছে। যেমন করিয়াই হউক, গুপ্তিপাড়ার দত্ত-বংশের মুখ রক্ষা করিতে হইবে। 'বেচারি উমা!' শবের সামনে দাঁড়াইয়া প্রকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

'দেখুন, চেনেন কি?' প্রশ্ন হইল।

'না।' ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ শবব্যবচ্ছেদাগার হইতে বাহির হইয়া আসিল।

আঠারো

ইহার পর মাস তিনেক কাটিয়াছে। গুরুতর আঘাত করার দায়ে তারাপদর দুই বছর জেল হইয়াছে। তারাপদ আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাও বলে নাই। নীরব থাকিয়া সে পরিবারের সম্মান রক্ষা করিয়াছে।

সম্মান বাঁচিল বটে, কিন্তু পরিবারের নূতন দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। একে তো তারাপদর সওয়া শো দেড়শো টাকা আয় বন্ধ হইল, তার উপর অফিস হইতে কাশীপতিরও ছুটি হইয়া গেল। সকল আয় বন্ধ হইল!

কাশীপতি প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। এর কাছে চাকরি চাহিতেছেন, ওর কাছে পরামর্শ লইতেছেন। প্রত্যহ নতুন নতুন ব্যবসায়ে নামিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, তারপর মূলধনের কথা ভাবিয়া হতাশ হইয়া সে চিন্তা ত্যাগ করিতেছেন। জীবন-যুদ্ধে লড়িবার জন্য তাঁর কোনও হাতিয়ারই নাই; এমন কি গায়ে খাটিবার শক্তি পর্য্যন্ত ঝিমাইয়া আসিয়াছে।

প্রথামত আজও কাশীপতি সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। জানা-শোনা লোক যাহার কথাই মনে পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে যাইয়াই দেখা করেন, এবং পরামর্শ ও পরে সহায়তা প্রার্থনা করেন। কিন্তু জরাজীর্ণ কেরাণীর প্রয়োজন কাহার? কোন্ পরামর্শ দিয়াই বা তাহাকে সাহয্য করা চলে? ব্যবসায়ে সতীশ লাহিড়ীর সাফল্য দেখিয়া একদা কাশীপতি মনে মনে ঈর্ষ্যা অনুভব করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তিনিও কেন সতীশের মতো চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসায়ে নামেন নাই। এখন ক্রমেই তিনি বুঝিলেন, ব্যবসা করা কত কঠিন।

ব্যর্থ হইয়া কাশীপতি মরিয়া হইয়া উঠিতেছেন। বলিতেছেন, 'পান সিগারেটের দোকান দিব,' 'শোন্‌পাপ্‌ড়ি ফেরি করিব,' আরও কত কি বলিতেছেন। উপবাসের রাক্ষসী নখ উদ্যত করিয়া কাছে আগাইয়া আসিতেছে। স্ত্রী-কন্যাকে ইহার থাবা হইতে বাঁচাইবার উপায় কি?

কাশীপতির শরীরটা আজ ভাল নাই। সুষমা বলিয়াছিল, 'আজ বেরিয়ে কাজ নেই, বাবা। আজ একটু শুয়ে থাকো।' কাশীপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তিনি শোবার ঘর হইতে তাঁর ছেঁড়া ফতুয়াটা আনিয়া সুষমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এটা একটু সেলাই করে' রাখিস্ তো, মা। ফিরে এসে যেন পরতে পারি।'

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নিজের ঘরে আসিয়া সুষমা ফতুয়াটা লইয়া পড়িয়াছে। নিত্যই তাহাকে হয় কাশীপতির জামাটা অথবা ধুতিটা মেরামত করিয়া দিতে হয়। কাশীপতি তালি মারিতে বলেন, সুষমা গভীর পরিশ্রম সহকারে রিপু করিতে বসে। বেচারি বাবা! সংসার চালাইতে কি বিপদেই পড়িয়াছেন! সুষমার বড়দা দুর্গাপদকে চিঠি লেখায় সে মাসিক দশ টাকা সাহায্য পাঠাইতেছে। তা ছাড়া, আর কোন আয় নাই; আয়ের সম্ভাবনাও নাই।

সুষমা পাশের তক্তপোষে ফতুয়া নামাইয়া সূচে সূতো পরাইয়া লইল। সেলাইটা তুলিয়া লইতে গিয়া সহসা উমার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। এই তক্তপোষে শুইয়া প্রতি দুপুরবেলা সে উপন্যাস পড়িত। নানা হাসি গল্প করিত। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের দুষ্টুমির খবর জানাইত। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিত।

বেচারি উমা! ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়াছিল, স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিয়াছিল, এই কি তার অপরাধ? তার সকল স্বপ্ন একটিমাত্র টোকায় চুরমার হইয়া গেল! সুখী হইতে চাওয়া কি অন্যায়?

দরিদ্র বলিয়া কি তাহাদের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখাও নিষেধ? তবে মনের মধ্যে সুখের জন্ম এই আকুলতা কেন?

সুষমা নিজে অবশ্য মনের মতো স্বামী ও ছোট একটি বাসা পাইলেই পরিতৃপ্ত। উমা আরও বেশি চাহিত। বাড়ি, গাড়ি, অলঙ্কার, উৎসব হাসি-উচ্ছ্বাস এ-সব না হইলে তার পরিতৃপ্তি ছিল না। সুখের জন্ম যাহা সে অপরিহার্য্য মনে করিত, তাহা সংগ্রহ করিতে গিয়াই সে এমন সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ইহাই তাহার স্বভাব; ইহাকে অস্বীকার করিবার তার উপায় ছিল না।

প্রথম একা একা এই ঘরে শুইতে সুষমার যেন ভয় করিত। উমার পরিত্যক্ত তক্তপোষটার দিকে চাহিত আর তার গা কাঁটা দিয়া উঠিত। মনে হইত, উমার অতৃপ্ত আত্মা যেন সুযোগ পাইলেই দিদির কাছে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির জন্ম ছুটিয়া আসিবে। ক্রমে সুষমার এই ভয় চলিয়া গেল। ভয়ের জায়গায় সহানুভূতি জন্মাইল। বেচারি উমা! যদি তাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া যাইত!

সুষমার পিঠটা ব্যথা করিতেছে। তাড়াতাড়ি আরও কয়েকটা সূচের ফোঁড় দিয়া সেলাইটা সে সরাইয়া রাখিল, এবং বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। বড় একা একা লাগে। শোক-দুঃখের বাড়িতে কোনও অবলম্বন নাই। উমা বাঁচিয়া থাকিতে এমন ফাঁকা মনে হইত না। এখন জীবনটা বড় বেশি শূন্য মনে হয়।

সুষমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক এলোমেলো স্বপ্নের পর সে 'দিদি, দিদি, দিদি!' ডাক শুনিয়া চমকাইয়া জাগিয়া উঠিল। শুনিল, কাশীপতি ডাকিতেছেন, 'সুষি, সুষি, সুষি।'

বিছানা হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সুষমা কহিল, 'বাবা।'

কাশীপতি এইমাত্র বাহির হইতে ফিরিয়াছেন। নিজের ঘরেও যান নাই। কন্যাকে দেখিয়া কহিলেন, 'প্রকাশকে একবার খবর পাঠিয়েছিলি, মা?'

'দুপুরের খাওয়া খেয়ে কারখানায় ফেরবার পথে তিনি নিজেই একবার খোঁজ নিতে এসেছিলেন। বলে দিয়েছি।'

'একটু তাড়াতাড়ি করে' আসতে বলেছিস্ তো?'

'সন্ধ্যার পরেই আসবেন।'

'এখন এই প্রকাশই আমাদের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু।' কাশীপতি কহিলেন। 'আর কেউ নেই। আমার তিন তিনটে ছেলে, আমার ভাবনা ছিল কি? কিন্তু বুড়ো বয়সে তারা কোনই কাজে লাগল না। একটা জেলে গেছে, একটা জুয়াড়ি গেঁজেল, আর একটা···এত বড় বিপদ গেল, এত করে' লিখলুম, দুর্গাপদ একবার এসে দেখে পর্য্যন্ত গেল না। কানপুর আর কতই বা দুর! বুড়ো বাপকে মাসিক দশ টাকা করে' মাসোহারা পাঠিয়ে সে কর্ত্তব্য···'

'ও কথা থাক, বাবা।'

'হ্যাঁ, থাক্। বলে কিছু লাভ নেই। জগতে কেউ কারো নয়। আমার বোঝা আমাকেই বইতে হবে। তাই তো ভাব্‌ছি, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করে' ফেলা দরকার! এ রকম করে' তো আর বেশিদিন চল্‌তে পারে না। এক পয়সা আয় নেই, অথচ কম করে' মাসে সওয়া শো দেড় শো টাকা খরচ হচ্ছে! বছর না ঘুরতেই পুঁজি-পত্তর উড়ে যাবে।—তাও যদি তোর একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে ফেলতে পারতাম···'

'বাবা, একটু চা করে' দিই আজ?' সুষমা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিল।

'চা!' কাশীপতি প্রায় আঁৎকাইয়া উঠিলেন; 'না না না। খবরদার নয়। ও সবে বাজে পয়সা ব্যয় করবার দিন আর নেই। আমি এইবার একটু শুয়ে পড়ি গে। বিস্তর হাঁটাহাঁটি পড়েছে। দেখিস্, আমি ঘুমিয়ে পড়লে প্রকাশ এসে যেন ফিরে না যায়। তার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। সন্ধ্যে হ'তে এখনও কোন্ না ঘণ্টা দেড়েক বাকি। তার আগেই আমি উঠে পড়ব। তবে যদি...'

'আমি তোমাকে ডেকে দেব, বাবা।' সুষমা উদ্বিগ্ন পিতাকে আশ্বাস দিয়া কহিল।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই প্রকাশ আসিল। সুষমা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, প্রকাশকে দেখিয়া কহিল, 'আসুন। বাবা আপনার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। এটা কি? না না, নিত্যি এসব আপনি আনবেন না...'

'এ কিছু নয়।' প্রকাশ কাগজের বাক্সটা সুষমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল। 'এ তো আমারও বন্ধুর বাড়ি। এটুকু অধিকার আমার থাকা উচিত। সে বাইরে থাকলে কিছুতেই এতে আপত্তি করতে পারত না...'

সুষমা আর কথা কাটাকাটি করিল না। কহিল, 'আপনি বাবার ঘরে যান। বিকেল থেকেই তিনি আপনার জন্য বসে আছেন...'

'যাচ্ছি।' বলিয়া অবিলম্বেই প্রকাশ কাশীপতির শোবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

যে-প্রকাশকে একদা কাশীপতি বাড়িতে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আজ আর সে সেই প্রকাশ নয়। আজ সে ইহাদের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু। ইহাদের বিপদে সে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়; ইহাদের অসহায় দারিদ্র্য তাকে পীড়া দেয়। একদিন সে আপনা

হইতেই কাশীপতিকে তার নিজস্ব কারখানার অংশীদার হইতে আমন্ত্রণ করিল। কাশীপতি আশ্চর্য্য মর্য্যাদার সঙ্গে এই লাভজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কহিলেন, 'তা হয় না, বাবা। আমি তোমাকে এমন কিছুই দিতে পারব না, যার বদলে লাভের অংশ দাবি করতে পারি। মনে হবে, একটা অজুহাত করে' মাসে মাসে একটা মাসোহারা আদায় করছি।' ইহার পর সে প্রসঙ্গ আর উঠানো যায় নাই।

'এসো, বাবা। বসো। এখানটায় বসো।' কাশীপতি প্রকাশকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর সোজা হইয়া বসিলেন।

প্রকাশ কাছে গিয়া বসিল, কহিল, 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বাবা। ডেকেছিলাম।' কাশীপতি কহিলেন। 'তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।' বলিয়া তিনি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর সহসা আবার শুরু করিলেন, 'যতই আমি ভেবে দেখছি প্রকাশ, ততই দেখতে পাচ্ছি, জাত আঁকড়ে পড়ে থাকা কত বড় মিথ্যা অহমিকা। জাত সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত ক্ষমতায়, ব্যক্তিগত চেষ্টায়, নিজস্ব কৃতিত্বে। কিন্তু এর যা ফল, তা আমরা বংশপরম্পরায় ভোগ করতে চাই উত্তরাধিকারের মতো। কিন্তু যেখানে ক্ষমতা নেই, প্রতিভা নেই, সেখানে জাতের অহমিকা একেবারেই ফাঁকা আওয়াজ। তাতে কোনও সার বস্তু নেই। একটা সূচ ফোটালেই তা চুপ্‌সে যায়।...আমার কেবলই মনে হচ্ছে, জাতের ওপর বসে থাকার কারুর একচেটিয়া অধিকার নেই। নিজ শক্তিতে যে যে-আসনের উপযুক্ত, সেইখানেই তার নিজের আসন। এই যে আমি উঁচু বংশের অহমিকা আঁকড়ে বসেছিলাম, তা বজায় রাখতে পারলাম কি? চুপ্‌সে গেল, সব চুরমার হয়ে গেল। এখন স্ত্রী-কন্যাকে খেতে-পরতে দেওয়াই আমার

পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সামান্য যা পুঁজি আছে, বসে খেলে তা কদ্দিন!...'

'আপনি কেন কারখানাটা দেখার ভার নিন্ না।' প্রকাশ কহিল। 'শত হোক্, হিসেব-পত্র আপনি যতটা...'

'তা হয় না।' কাশীপতি ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশের বদান্য আমন্ত্রণ অস্বীকার করিলেন। 'কোনও কিছুর ভার নেবার ক্ষমতা আর আমার অবশিষ্ট নেই।...আমি বলছিলাম কি, জানো প্রকাশ...' এইখানে কাশীপতি সামান্য দ্বিধা করিয়া তারপর কহিলেন, 'তোমাদের ওখানে শস্তায় একটা ঘর-টর দেখে দিতে পার না? মাসিক চল্লিশ টাকা করে বাড়ি ভাড়া গুণবার আর তো সামর্থ্য নেই। এখানে কিছু টাকা বাঁচাতে পারলে...তুমি কত ভাড়া দাও?'

'আজ্ঞে, আমি সামান্যই দিই', প্রকাশ ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল। 'কিন্তু আমরা ওখানে অনেক বছর ধরে আছি। আপনি নতুন করে নিতে গেলে পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কম পাবেন বলে মনে হয় না। তাতে কি খুব লাভ হবে?'

'ওঃ, অত!' কাশীপতি ঘাব্ড়াইয়া গেলেন।

কয়েক সেকেণ্ড কেহ কোনও কথা বলিল না। অতঃপর কাশীপতি কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না প্রকাশ? তোমার আয় বেড়েছে; স্বচ্ছন্দে তুমি চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে পারো। শুনছিলাম, তুমি নাকি পাকা বাড়ি খুঁজছ। তবে তুমিই না হয় আমাদের বাড়িটা নাও; আমরা তোমার বাড়িটায় গিয়ে শস্তায়...'

'বেশ তো, আমি এখানে আসব।' প্রকাশ গম্ভীরস্বরে কহিল। 'কিন্তু এতগুলি ঘরের তো আমাদের দরকার নেই; দুটো হলেই আমাদের কুলিয়ে যাবে। এই মাগ্গির বাজারে চল্লিশ পঞ্চাশ

টাকায় যদি দুটো ঘর পাই, তবে কি তা কম সৌভাগ্যের কথা। বাকি ঘরে আপনাদেরও স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে·

কাশীপতি দুই সেকেণ্ড হাঁ করিয়া প্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার অবস্থা হইল। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া তিনি কহিলেন, 'তুমি মহৎ। তুমি বড়। কিন্তু এতে আমি রাজি হ'তে পারব না। উচ্চাসনে কারুর একচেটে অধিকার নেই। আমার নিচে নেমে যাবার সময় হয়েছে। আমাকে নামতে দাও।···হ্যাঁ, প্রকাশ, একটা কথা। একদিন তুমি সুষিকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলে। আমি কুল-মর্য্যাদার অহঙ্কারে তোমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমরা সব দিক থেকেই তোমার চেয়ে নিচু হয়ে গেছি; গর্ব্ব করবার আর কিছু নেই।···আজও তোমার আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করবার ইচ্ছে আছে কি? বল, না করেই···'

'এমন সৌভাগ্যও কি আমার হবে!' প্রকাশ নিম্নস্বরে কহিল।

'নাও। তবে নাও।' কাশীপতি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন। 'সুষিকে তোমার হাতে দিলাম।··অন্তত সে উঁচুতে থাকুক। সে সুখী হোক···'

প্রকাশ খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বৃদ্ধের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। প্রায় কৃতজ্ঞ কণ্ঠে কহিল, 'আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ আপনি পূর্ণ করলেন, বাবা। আমি এর উপযুক্ত হ'তে চেষ্টা করব···'

কাশীপতি প্রকাশকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, 'সুষি, সুষি, সুষি···'

সুষমা ছুটিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, 'কি বাবা?'

'প্রকাশকে একটু চা বানিয়ে দিতে পারিস?' কাশীপতি উদ্ভাসিত মুখে কহিলেন। 'দেখ্, আমার শার্টের পকেটে ক'আনা পয়সা আছে, ছুটো সন্দেশও...'

'সন্দেশ উনি নিজেই অনেক নিয়ে এসেছেন!' সুষমা সহাস্যে কহিল। 'তোমাকেও এক কাপ চা দেব কি?...'

'দে, মা, দে,' কাশীপতি সাগ্রহে কহিলেন। 'আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন। আজ যা ইচ্ছে দে...'